ভোরের শিশির

কাহালু সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়
এর প্রথম ম্যাগাজিন

প্রকাশকাল
২৯ ডিসেম্বর ২০২৪

প্রচ্ছদ
আহাদ আলী সরকার

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মোঃ ফাহিম আহম্মেদ
প্রাক্তন শিক্ষার্থী
কাহালু সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়

মুদ্রণ
আহাদ আলী সরকার
করণিক-কাম-মুদ্রাক্ষরিক (খণ্ডকালীন)
কাহালু সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়
মোবাইল: ০১৭৫৪-৫৫৯২৭১

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
এফ.এম.এ. ছালাম
প্রধান শিক্ষক
কাহালু সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়,
কাহালু, বগুড়া।

সম্পাদক
মোহাম্মাদ আব্দুর রউফ হোসেন
সহকারী শিক্ষক (বাংলা)
কাহালু সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়,
কাহালু, বগুড়া।

শুভেচ্ছা মূল্যঃ ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

উৎসর্গ

কাহালু সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠালগ্নে যাঁরা শ্রম, মেধা ও অর্থ দিয়ে

বিদ্যালয়টিকে বর্তমান রূপ দিয়েছেন

তাঁদের প্রতি ।

সম্পাদকীয়

প্রিয় পাঠক,

ভোরের আলো যখন প্রকৃতিতে নতুন বার্তা দেয়, তখন ঘাসের ওপর জমে থাকা শিশির বিন্দু হলো আমাদের জীবরেন এক নতুন উপলব্ধির কথা বলে। প্রতিটি শিশির বিন্দু যেন, আশা, তাজা ভাবনা আর উদ্যমের প্রতীক। আমাদের জীবনের নানা বাঁকেও এমন নতুন সূচনা প্রয়োজন যেখানে প্রতিদিন নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা যায়।
এই চিন্তা থেকেই আমাদের এবারের প্রকাশনা 'ভোরের শিশির'। এখানে জীবন সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য এবং স্বপ্নের রঙিন কাব্য তুলে ধরা হয়েছে। লেখকদের মেধা আর পাঠকদের ভালোবাসা নিয়ে আমরা গড়ে তুলতে চাই এমন একটি পাঠক পরিবার, যেখানে প্রতিটি শব্দ প্রাণ পায়।
এই সংখ্যায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তরুণ লেখদের সৃজনশীল ভাবনাকে। পাশাপাশি কবিতা, গল্প, উপন্যাস, কৌতুক, রচনা, প্রবন্ধ এবং সমকালীন বিষয় নিয়ে আলোচনা। পাঠকের মনে আনন্দ ও চিন্তার খোরাক জোগাতে আমরা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ।
ভোরের শিশির যেমন সতেজতা নিয়ে আসে, তেমনি আমাদের এই প্রয়াস আপনার মনে তাজা বাতাস হয়ে পৌঁছানে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আপনাদের মতামত ও পরামর্শ আমাদের চলার পথকে আরো সমৃদ্ধ করবে। আপনাদের সহযোগিতা আমাদের একমাত্র প্রেরণা।

শুভ কামনায়
সম্পাদক,
ভোরের শিশির

প্রধান

প্রিয় পাঠকবৃন্দ,

ভোরের শান্ত বাতাসে শিশির বিন্দুর মতোই আমাদের বিদ্যালয়ের ম্যাগাজিন 'ভোরের শিশির' একটি নতুন আলোর দিগন্ত উন্মোচন করতে চলেছে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও চিন্তাশীল মননকে প্রকাশের সুযোগ করে দিতে আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি।

আমাদের শিক্ষার্থীদের মাঝে লুকিয়ে থাকা প্রতিভা ও সম্ভাবনাকে তুলে ধরাই এই ম্যাগাজিনের মূল উদ্দেশ্য। এখানে তাদের কবিতা, প্রবন্ধ, চিত্রকলা ও নানাবিধ সৃজনশীল কাজ প্রকাশ পাবে। যা পাঠকের মন ছুঁয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত যে, আমাদের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 'ভোরের শিশির' তার অনন্য সজীবতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এ উদ্যোগ শুধু শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশেই সহায়তা করে না, বরং তাদের আত্মবিশ্বস গড়ে তুলতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সকলের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আশা করি, এই ম্যাগাজিন ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের আরও বড় হতে সাহায্য করবে এবং সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

শুভ কামনায়

প্রধান শিক্ষক,

কাহালু, সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়,

কাহালু, বগুড়া।

প্রধান শিক্ষকের বাণী

“Education is not Preparation of life, rather it is living”

শিক্ষা শুধু জীবন প্রস্তুতির উপায় নয়, তা জীবন-যাপনের প্রণালীও বটে।

শিক্ষাকে জীবনব্যাপি অনুসরণীয় প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে হবে এবং অভিজ্ঞতাকে শিক্ষা লাভের স্বাভাবিক কৌশল হিসেবে বিবেচনায় রাখতে হবে। আধুনিক শিক্ষা দর্শনে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্তা বিকাশের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধ জাগ্রত করা এবং তাকে আত্মসত্তার আস্থাবান করে তোলাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

এ স্কুলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সুপরিকল্পিত পাঠ্যক্রম, সহ-পাঠ্যক্রম কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক গুণাবলীর সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সাধন যাতে তারা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে এবং ভবিষ্যতে দেশ ও জাতিকে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে পারে। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে অভিজ্ঞ, প্রশিক্ষিত ও নিবেদিত প্রাণ শিক্ষকমন্ডলী, অত্যাধুনিক পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ল্যাব ও ব্যবহারিক ক্লাস এবং অত্যাধুনিক স্মার্ট ক্লাস রুম। এ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে আধুনিক তথ্য ও বইসমৃদ্ধ লাইব্রেরি; যেখানে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন বই। প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিমুক্ত এবং প্রকৃতিগতভাবে সাবলীল একটি আবাসিক প্রতিষ্ঠান।

এফ.এম.এ. ছালাম
প্রধান শিক্ষক
কাহালু সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়
কাহালু, বগুড়া।

সহকারী প্রধান শিক্ষকের বাণী

আসসালামু আলাইকুম। আমি সর্ব প্রথম স্মরণ করছি তাঁদেরকে যাঁরা অর্থ, সম্পদ, শ্রম এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কাহালু সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়কে গড়িয়েছেন। ০১ লা জানুয়ারি ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে এই বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুদীর্ঘ সময় অতিক্রম করে আজ বিদ্যালয়টি একটি অভিজ্ঞ ম্যানেজিং কমিটি এবং দক্ষ শিক্ষক-কর্মচারী দ্বারা সঠিক নির্দেশনায় পরিচালিত হয়ে আসছে। যার ফলশ্রুতিতে ২০০৯ সালে রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডে ৮ম স্থান লাভসহ প্রতি বছর এসএসসি ও জেএসসি পরীক্ষায় প্রায় শতভাগ সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১৫ সালে এসএসসি-তে শতভাগ পাশ করেছে এবং ফলাফলের ভিত্তিতে উপজেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুইবার ১ লক্ষ টাকা উদ্দীপনা পুরস্কার পেয়েছে। সেই সাথে বিদ্যালয়টি উপজেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে আসছে। বর্তমান বিদ্যালয়টি মডেলে রুপান্তরিত হয়েছে এবং বিদ্যালয়টি ২১মে ২০১৮ খ্রি. তারিখে জাতীয়করণ হয়েছে। তিনটি স্তরে প্রায় ১০০০ (এক হাজার) জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিসহ পাঠদান চলছে। স্তরগুলো হচ্ছে-

১। সাধারণ শিক্ষা
২। কারিগরি শিক্ষা
৩। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএসসি প্রোগ্রাম।

উক্ত তিন স্তরের মধ্যে দুটি স্তরের পরীক্ষা কেন্দ্র চালু আছে। অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যালয়টি আরও উচ্চ শিখরে স্থান করে নিতে পারবে-এটাই আমার বিশ্বাস।

মোঃ ফেরদৌস আলী সেখ
সহকারী প্রধান শিক্ষক
কাহালু সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়
কাহালু, বগুড়া।

অল্প কথার গল্প

অর্ক রায়

কমলাপুর থেকে অনেক দূরে মাইল-পঁচিশেক এসে থামল। গাড়ি থেকে কয়জন লোক নামলেন। তারা সবাই একে-ওপরের পরিচিত। লোকগুলোকে দেখে অনেক ভদ্র স্বভাবের মনে হচ্ছিল। স্টেশন থেকে একটু দূরে একটু দূরে গিয়ে বোঝা গেল তারা সবাই বন্ধু। তাদেরকে দেখে বোঝা গেল সবাই খুশি আর উৎফুল্লে আছেন। তারা সবাই মিলে যাচ্ছেন এক বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধুর বাড়িতে ছিল পার্টির নিমন্ত্রণ। তাদের বন্ধুর নাম ছিল রিসব। রিসব ছিল ওদের সবার অনেক প্রিয়। রিসব তাদের প্রতিবছরই নিমন্ত্রণ করে কিছু না কিছু উপহার দেয়, এবারেও দেবে হয়তো।

তাই সবার মনে একটা গভীর উত্তেজনা। এবার তারা কিছু পথ হাটার পর একটা নতুন গাড়িতে চড়ে রওনা দিল রিসবের বাড়ির দিকে। বন্ধুর বাড়ির দিকে যেতে-না-যেতেই তাদের চোখে ভয়ের আশঙ্কা। গাড়ি থেকে বাইরে তাকিয়ে সবাই দেখতে পেল জনমানবহীন পথ। আশেপাশে ধু ধু করছে।

একদিকে সবার মনে মনে ভয় আর অন্যদিকে রিসবের বাড়িতে পার্টিতে যোগ দেওয়ার আনন্দে পোঁছে গেল গন্তব্যস্থলে। সেখানে পৌছেই তারা সবাই দেখতে পেল রিসব তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। রিসব তাদেরকে দেখে সামনে এগিয়ে গেল। সবাই রিসবের সাথে কথা বলা শেষ করে রিসবের বাড়িতে প্রবেশ করল।

রিসবের বাড়িতে পার্টির আয়োজন দেখে তারা মনে মনে ভাবতে লাগল, এত লোকজন এত বড় বাড়ি অবাক করার মতো। রিসব তার বন্ধুদেরকে সাথে নিয়ে পার্টিতে অনেক মজা করল। পার্টি শেষ করে সবাই রিসবকে প্রশ্ন করছে এত কিছু কিভাবে সম্ভব বন্ধু? রিসব তার উত্তরে বললো কেবল তো শুরু। আরও অনে কিছু দেখার বাকি এখনো।

কথা বলা শেষ করে রিসব তার বন্ধুদেরকে সাথে নিয়ে তার ল্যাবরেটরির দিকে গেল। ল্যাবরেটরিতে ঢুকতেই সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। অবাক হয়ে সবাই তাঁদের মাথার ওপরে দেখে শত শত আলোর নাশপাতির মতো বিদ্যুৎবাতি। ল্যাবরেটরির বাইরে দাঁড়িয়ে রিসব হাসছে। রিসব বলল, "কেমন দেখছো"? বন্ধুদের কিন্তু চোখের পলক পড়ছে না। সব বন্ধুদের প্রথমদিন চমকে দিয়েছিল এভাবেই, অদ্ভুত একরকমের বিদ্যুৎবাতি দেখার সুযোগ দিয়ে।

বন্ধুত্বের মূল্য

খালিদ হাসান রিমন

শ্যামলপুর নামে একটি সুন্দর গ্রাম ছিল। যেমনি গ্রামের নাম, তেমনি গ্রামের প্রকৃতি। গ্রামটি ছিল সবুজে ভরা ও মনোমুগ্ধকর। গ্রামের প্রতিটি জিনিস ছিল একে অপরের ছায়াসঙ্গী। সকলেরই মিলনবন্ধন যেন ছিল একসূত্রে গাঁথা।

সেই শ্যামলপুর গ্রামে বাস করত সিয়াম ও সুমন নামে দুই বন্ধু। তারাও ছিল এক অপরের ছায়াসঙ্গী। যেকোনো সময় একজনের বিপদে অন্যজন এগিয়ে আসে। এমনি এক সময়-

সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল। প্রতি বছরই এ সময় গ্রামে মেলা বসে। এবারও বসেছে। তারা দুই বন্ধু মেলায় যাওয়ার জন্য উত্তেজিত হল এবং মেলায় যাওয়ার সময় ঠিক করলো। বিকেলবেলা তারা দুইজন মেলায় গেল। পুরো মেলা তারা ঘুরে দেখলো এবং উপভোগ করল। হঠাৎ সিয়াম দেখলো সামনে খুব ভিড় জমেছে। সিয়াম এগিয়ে গিয়ে দেখলো বইয়ের দোকান। আসলে, মেলায় একটি আকর্ষনীয় বিষয় হলো বিভিন্ন বই, যেমনঃ সাহিত্য, নাটক, উপন্যাস, কবিতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহ আরও অন্যান্য বিষয়ক বইয়ের দোকান। সিয়াম বিভিন্ন ধরনের বই দেখলো। কিন্তু সাহিত্যের বই তার খুব পছন্দ হয়। কিন্তু তার কাছে বই কেনার কোনো টাকা ছিল না। তাই সে মন খারাপ করে। তখন সুমন তাকে বলে তুই মন খারাপ করিস না, "সিয়াম"। তোর চিন্তা করার দরকার নেই। আমি তোকে বই কিনে দিব।

সিয়াম প্রথমে নিতে রাজি হয় না, কিন্তু সুমনের জোড়াজুড়িতে সে বইটি নিল। প্রথমে নিতে চাইছিল না কারন সেই টাকা ছিল সুমনের জমানো টাকা। তারা মেলায় আরও কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল এবং মজার সময় কাটাল। বাড়ি ফেরার পথে সিয়াম সুমনকে বলল, "তুই আমার জন্য যা করলি, তার জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ। বন্ধুত্বের মূল্য তুই আজ আমাকে বুঝিয়ে দিলি।

সুমন হাসি দিয়ে বলল, "বন্ধুত্ব মানে একে অপরের পাশে থাকা, সুখে-দুঃখে সাহায্য করা আমরা সবসময় একে অপরের পাশে থাকব।

হঠাৎ একদিন সিয়ামকে নিয়ে তার বাবা-মা শহরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এ খবর সিয়াম ও সুমন জানতে পেরে খুব মন খারাপ করে। তারা মনে মনে ভাবে তাদের বন্ধুত্ব বোধ হয় এখানেই শেষ। তাই তারা খুবই কষ্ট পায়। তারা দুজন ভাঙা মন নিয়ে বাড়ি যায়।

পরদিন সকালে সিয়াম ও তার পরিবার শহরে চলে যায়। কিন্তু সিয়াম যাওয়ার আগে সুমনকে বলে নি, কারণ সে খুব কষ্ট পাবে। এভাবেই কিছুদিন চলে যায়।

হঠাৎ একদিন সুমনের কাছে চিঠি আসে। সে চিঠিটি খুলে যখনি দেখল যে, চিঠিটি ছিল সিয়ামের তখন, সে আর খুশি ধরে রাখতে পারে না। সে মনে করে তাদের বন্ধুত্ব এখনো শেষ হয়নি এভাবেই তারা কথা বলতে থাকে। এমনি একদিন সুমন খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ খবর শুনে সিয়াম খুব চিন্তিত হল এবং সেদিনই সে গ্রামে ফিরে এলো। সিয়ামকে দেখে সুমন কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠে। এর কারণ হলো সিয়াম সবসময় তার সাথে থেকেছে তার সেবাযত্ন করেছে ও তার খেয়াল রেখেছে। এসব্ করার পর সুমন সিয়ামকে বলে তার এই ঋণ আমি কোনোদিনই শোধ করতে পারব না।

তখন সিয়াম বলে, না, না, এসব বলিস না। বন্ধু হিসেবে তো এটি আমার কর্তব্য ছিল। এ কথা শুনে সুমন বলল, সিয়াম, তুইও আবার প্রমাণ করে দিলি বন্ধুত্বের মূল্য কতটা।

এই গল্প থেকে আমাদের শিক্ষা হলোঃ

আমাদের প্রত্যেকের উচিত ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা অন্য যেকোনো মানুষের বিপদে-আপদে সাহায্য করা, এগিয়ে আসা। কারণ বন্ধুত্বের মূল্য অনেক।

তাই আমরা যেকোনো বিপদে বন্ধুদের সাহায্য সহযোগীতা করব। তাদের কষ্ট দিব না, তারা মন খারাপ করে এমন কোনো কাজ করব না। বন্ধুত্বের মূল্য অনেক যা কোনো টাকা দিয়ে কেনা যায় না।

নির্জন প্রকৃতির পটে

আব্দুল্লাহ আল বাকী

নীরব বাতাসে ভেসে আসে অজানা গানের সুর,
পাহাড়ের কোলে মেঘের নাচন, একা একা দূর।
নদীর ঢেউয়ে রোদ ঝলমল, আলো আঁধারের খেলা
জীবনের ছন্দে বয়ে চলে প্রকৃতির একেলা।

বনভূমির গভীরে লুকিয়ে থাকে রাতের সব গল্প,
তারার নিচে গাছের পাতায় বাতাসের চাপল্য।
সবুজে মেশানো নীল আকাশের প্রান্তর জুড়ে,
পাখিদের ডাকে ভোরের আলো ভেঙে যায় ঘুম সুরে।

তুমি শুনতে পাবে কি সেই ঝিঝির মিষ্টি কণ্ঠস্বরে,
যে দিগন্ত পেরিয়ে আসে স্বপ্নের কোনো ধ্বনি তরে।
প্রকৃতি তো নয় নিস্তব্দ, সে তো চিরচঞ্চল প্রাণ,
মনের আকাশে সে তো লিখে অগণন অসমাপ্ত গান।

মেঘলা দিনের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের মুখ দেখা,
প্রকৃতির বুকেই লুকিয়ে থাকে হাজার বছরের রেখা।
নির্জনে দাঁড়াও যদি, শুনবে তার অব্যক্ত ভাষা,
তবু মানুষ খুজে ফেরে কেবল তার মায়াবী উপমা।

গাছ

বায়েজিদ হোসেন

গাছ আমাদের পরম বন্ধু
গাছ আমাদের প্রাণ,
গাছ ছাড়া বাঁচবো কী করে?
গাছ আমাদের সাহায্য করে,
গাছ আমাদের ফল দেয়
গাছ আমাদের ফুল দেয়।
খাবার রান্না করি প্রতিনিয়ত,
কাঠ হয় জ্বালানির উৎস।
রোপন করব প্রতিনিয়ত,
গাছ আমাদের প্রাণের উৎস।
গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়,
ছায়া দেয় আর ঘর দেয়।
গাছ ছাড়া আপন বন্ধু ভাই,
পৃথিবীতে আর কেউ নাই।

“পানি লাগবে পানি”

বায়েজিদ হোসেন

“পানি লাগবে কারো পানি”
“পানি লাগবে কারো পানি”
অস্থির সেই কণ্ঠ আর
শুনতে পারো না জানি।
মায়ের বকুনি
আর শুনতে হবে না কখনো।
অসহায় বন্যার্তদের কাছে
ছুটে যাবে হয়তো
অন্য কোন মুগ্ধ।
কোন সে পাষাণ কাপুরুষ সেদিন
করলো এমন কাজ
মুগ্ধের বুকেতে দেশপ্রেম ছিল
তোমার ছিল না লাজ।
চোখ দুটো মুছে
গায়ের টি-শার্টে
দুঃখের যত গ্লানি
তবুও মুগ্ধরা বলে উঠবে
পানি লাগবে কারো পানি
পানি লাগবে কারো পানি

বাস্তব

বায়েজিদ হোসেন

শিশু কালে মায়ের আদর
বাবার কাঁধে চড়া।
বালক কালে একা একা
ঘুরে বেড়াতাম পাড়া।
এইতো সেদিন ছোট্ট ছিলাম
কবে বড় হলাম।
দুঃখ সুখের কত বছর
পিছনে ফেলে এলাম।
ছোট্ট বয়স পেরিয়ে এলাম
যুবক বয়সে পা দিলাম।
বাবা-মা আজ দাদা-দাদি
আমি বাবা হলাম।
আমার ছেলে আমার মত
বায়না ধরে শত।
মুখের হাসি ভুলিয়ে দেয়
দুঃখ ব্যাথা ক্ষত।

দুঃখিনী মা

মোঃ সাকিব হাসান

আমাদের গ্রামের নামটি ছিল শাহজাহানপুর। সেই গ্রামের আবুল নামে একজন গরীব মানুষ ছিল। তার তেমন অর্থ সম্পদ ছিল না। সে দিন মজুরি কাজ করতেন। তিনি দিনে ৫০০ টাকা ইনকাম করতেন। সেই টাকা থেকে ২০০ টাকা করে জমা করত। আর নিজের জন্য ১০০ টাকা খরচ। আর তার পরিবারের জন্য ২০০ টাকা খরচ হতো। তার পরিবারের সদস্য ছিল ৪ জন। সেই সদস্য ছিল তার বাবা, মা, তার দুই ভাই। এবং তার বউ ১ মাস পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। সেই শোকে তার শরীর তেমন ভালো নেই। কাজেও যেতে পারে নি। তিনি না কাজ করার জন্য পরিবারের অবস্থা নাজেহাল হয়ে গেছিল। তার বড় ছেলে কোনো কাজকাম করত না। সব খারাপ ছেলেদের সাথে ঘুরত। এবং নেশা করত। মদ পান করত। সিগারেট খেতো, গাজা, মদ, মাদকশক্তিই আসক্ত হতো। আর একদিন মদ না পেলে মাথা ঠিক থাকে না। সবার সাথে খারাপ ব্যবহার করত। আর টাকার জন্য বাবার জমানো টাকা দিয়ে নেশা করত। আর এবং কী ও তার মায়ের গহনা বেচে মদ পান করত। এবং টাকার জন্য মাকে বাড়িত থেকে বের করে দিয়েছেন। মা টাকা না দেওয়াই বের করে দিলেন বাড়ি থেকে। বাড়িতে মা একদিন হঠাৎ তার জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার বড় ছেলের জন্য। আর তার মায়ের সারাটাজীবন দুঃখের উপর দিয়ে বয়ে গেল। দুঃখিনী মায়ের দুঃখ ছাড়া আর কিছুই রইল না। কিন্তু হঠাৎ একদিন তার মাও দুনিয়া ছেড়ে যাই। তাই সকল ছেলের উচিত তার মাকে এই কষ্ট না দেওয়া।

ভূতের গল্প

সিজান আহমেদ (আসিব)

মুক্তিযুদ্ধের সময় একটি আরমি অফিসার ও তার স্ত্রী ও ৭ ছেলে সন্তান শীতলাই গ্রামে বাস করত। ওই আরমি অফিসার মুক্তিযুদ্ধের সময় কাজে অন্য সেক্টরে চলে যেত। তার স্ত্রী ও ৭ সন্তান নিয়ে তবে স্ত্রী একা থাকত। প্রতি রাতে তাদের বাড়ির মধ্যে একটা অদ্ভুদ কালো ছায়া আসত। সে কালো ছায়া প্রতি রাতে এক জন করে ছেলেকে

মেরে ফেলত। যখন শেষ ছেলে ছিল তখন তার স্ত্রী ওই কালো ছায়াকে বলল যে দয়া করে একে মারবেন না। তখন ওই কালো ছায়া বলল তাহলে এই বাড়িতে কোনো ছেলে সন্তান আনা যাবে না। তখনি তারা ওই বাড়ি ছেড়ে নতুন একটা বাড়ি করে। তারপর থেকে তাকে আর দেখা যায় নি। এটা একটা সত্যি ঘটনা।

দয়ার রাজার ন্যায়পরায়ণতা

জাহিন ইসলাম

একবার একটি রাজ্যে রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তার রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল। কিন্তু একটি তিনি জানলেন কিছু অসৎ লোক গোপনে রাজ্যর ধন-সম্পদ চুরি করছে। রাজা সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি নিজে শহরে যাবেন ও সত্যতা জানবেন। তিনি সাধারণ পোশাক পড়ে বের হলেন। রাজা দেখলেন কিছু লোক গোপনে রাজ্যের ধন-সম্পদ চুরি করছে। রাজা তাদের কাছে গিয়ে জানতে পারেন তারা অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। এজন্য তার বাধ্য হয়ে চুরি করছে। তিনি লোকদের বললেন আমি তোমাদের সাহায্য করব। রাজা ফিরে গিয়ে চোরদের খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্য পাঠালেন। চোররা দেখল রাজা তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছেন তখন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন। এবং চুরি ছেড়ে দিয়ে রাজাকে সাহায্য করা শুরু করল। রাজা তাদের ক্ষমা করে দিল। এ গল্প থেকে আমরা জানলাম যে ক্ষমা অনেক বড় বড় সমস্যাকে সমাধান করে।

স্বপ্ন

আব্দুল্লাহ আস সাদ

নাম তার সিয়াম। সে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। সে স্বপ্ন দেখে, কিন্তু তা অবাস্তব। তার স্বপ্নের উদাহরণ দিলে তোমরা নিশ্চয়ই অট্টহাসি দিবে। যেমনঃ সে বলে আমি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট, শিক্ষক ও ব্যাংকার সব পেশায় একা নিজেই কাজ করতে চায়। আবার, সে বলে আমি সবার থেকে টাকা নিয়ে একটা স্কুল ও হাসপাতাল খুলতে চাই এবং সেখানকার সবাই আমর সুনাম করবে। আবার সে যুক্তি দেয় যে রংধনুর নিয়ে গুপ্তধন থাকে সোনা, হীরা, রূপা আর কত কী! তাকে অনেকেই পাগল বলে। কিন্তু তার চিন্তা পাগলের মতো হলেও তার কিন্তু কারও ক্ষতি করার ইচ্ছা নেই। তার মনে হয়ত কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছা নেই কিন্তু তোমরাই চিন্তা করত যে একজন মানুষ হয়ে যদি সে সব পেশায় নিয়োজিত হতে চায় তাহলে চাকরির সুযোগ অনেকেই পাবে না। অর্থাৎ, চাকরির যোগ্যপ্রার্থী পাবে না। আর তার তৈরি করা হাসপাতাল ও স্কুলের জন্য যারা টাকা দিবে তাদের মোটা পরিমাণ অর্থ দিতে হবে। হাসপাতালে অসুস্থ রোগী যদি তার সুনাম করে তা হলে তার রোগ আরও বেড়ে যাবে। স্কুলের সবাই সুনাম করলে লেখাপড়া আর হবে না। আর তার আরেক ইচ্ছা ত রংধনুর গুপ্তধন নেয়া যা স্বপ্নেও কারও সত্য হবে না।

এখন, তোমাদের বলি স্বপ্ন দেখা ভালো কিন্তু তা বাস্তবের সাথে যেন মিল থাকে। তখন সেই স্বপ্ন সার্থক হতেও পারে। শুধু স্বপ্ন দেখাই নয় স্বপ্ন পূরণ করার জন্য কাজও করতে হবে। সিয়ামের মত শুধু স্বপ্ন দেখলে সবাই পাগল বলাটাই স্বাভাবিক।

বিড়াল ছানার গল্প

শাহারিয়ার (শুভ)

ঝিলি ও মিলি দুই বোন। দেখতে একই রকম। সবাই ডাকে ঝিলিমিলি। দুজনের দুটি বিড়াল। ঝিলির বিড়াল সাদা। মিলির বিড়াল কালো। বিড়াল দুটির খুব বন্ধুত্ব। একসাথে ঘুরে বেড়ায়। দুষ্টুমি করে। ঝিলিমিলি স্কুল থেকে ফিরলে দৌড়ে কোলে ওঠে। ওরা খেতে বসলে বিড়াল দুটি পাশে বসে। ঝিলি-মিলি মাছ খেতে দেয়। বাটিতে করে দুধ দেয়। বিড়াল দুটি মজা করে খায়। একদিন হঠাৎ করে কালো বিড়ালটা উধাও। ঝিলিমিলির ভীষণ মন খারাপ। এ-বাড়ি, ও-বাড়ি খোঁজ করল। কিন্তু কোথাও নেই। সাদা বিড়াল মন খারাপ করে বসে থাকে। মিলি কাঁদে। ভাবে, কোথায় হারিয়ে গেল বিড়ালটি? দুদিন পর সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ শোনা গেল, মিঁউ মিঁউ। ঝিলি-মিলি দৌঁড়ে এলো। দেখে,

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে কালো বিড়ালটি। দুজন কী খুশি! সাদা বিড়ালও খুশিতে লাফায়ে উঠল। কিন্তু এ কী! কালো বিড়াল খুঁড়িয়ে হাঁটছে কেন? মিলি কোলে নিয়ে দেখে পায় ক্ষত। হয়তো কেউ মেরেছে। মা বললেন, এভাবে কেউ মারে! বাবা বললেন, চিন্তা করো না। আমি ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছি। কয়েক দিন পর পা ঠিক হয়ে গেল।

ছোটরাও পারে

যোবায়ের হোসেন

অপু, প্রিয়া, পিয়াল, রাফি, মেঘা নবম শ্রেণিতে পড়ে। তারা সবাই ছিল খুব ভালো বন্ধু। তাদের সবার বাড়ি ছিল এক জায়গায়। তারা সবাই একসাথে স্কুলে যায় এবং একসাথে বাড়ি আসে। রাফিদের বাড়ির পাশে ছিল একটা মাঠ। ঐ মাঠে সবাই প্রতিদিন বিকেলে খেলাধুলা করে ও গল্প করে। একদিন মাঠে সবাই আসলেও অপুর আসতে দেরি হয়। সবাই অপুকে বলে, তোর আসতে দেরি হল কেন? অপু বলল আজ আমাদের বাড়িতে আমার মামা-মামি এবং মামাতো ভাই বেড়াতে এসেছে। তাই আসতে দেরি হলো। তোরা জানিস আমার মামাতো ভাই বিদেশে পড়াশোনা করে। প্রিয়া বলল আমারও বিদেশে পড়াশোনা করার ইচ্ছা আছে। মেঘা বলল আমারও ইচ্ছা আছে। পিয়াল বলল সবাই যদি বিদেশে পড়াশোনার জন্য যায় তা হলে দেশে কে পড়বে। এইভাবে তাদের গল্প চলতে থাকে।

পরদিন বিকেলে তারা সবাই মাঠে আসে। তারা লক্ষ্য করে যে সিগারেটের গন্ধে মাঠে থাকা যাচ্ছে না। তারা দেখে মাঠের ঝোপে কারা কথা বলছে। তারা লুকিয়ে ঝোপের ধারে যায়। গিয়ে দেখে কিছু লোক সিগারেট খাচ্ছে। অপু তাদের কাছে যায় এবং তাদের বলে মাঠ থেকে যেতে। লোকগুলো বলে এই বাচ্চারা তোরা এখানে কি করিস। যা ওদিকে গিয়ে খেল। তারা মাঠের এদিকে চলে আসে। অপু বলে আমাদের কিছু একটা করতে হবে। রাফি বলে কি করবি? মেঘা বলে ঐ ঝোপগুলো কাটলে ওরা আর ওইখানে সিগারেট খেতে পারবে না। পিয়াল বলে তখন ওরা অন্য জায়গায় গিয়ে খাবে। প্রিয়া বলল আমাদের এই সিগারেটের উৎস খুঁজে বের করতে হবে। কোন দোকানে বিক্রি হচ্ছে। দোকানদার কী জানে না ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। অপু বলে দোকানদার জানা সত্বেও বিক্রি করে কারণ এটি তাদের পেশা যা নেশায় পরিণত হয়েছে। আজকাল আমাদের মতো কিশোররাও মাদকে আসক্ত হচ্ছে। রাফি বলে এর তো কিছু করা দরকার। মেঘা বলে আমরা এলাকার সব জায়গায় ধূমপান ও মাদকের কুফল সম্পর্কে পোস্টার লাগাব। অপু বলে এতে কাজ হবে বলে মনে হয় না। প্রিয়ার কথাই ঠিক। কোন দোকানে এই সব বিক্রি হয় তা খুঁজে বের করতে হবে। রাফি ও পিয়াল এই দায়িত্ব তোমাদের দিলাম। রাফি ও পিয়াল এলাকার দোকানের সামনে লুকিয়ে নজর রাখে। একটুপর একটা লোক দোকান থেকে সিগারেট কিনে নিয়ে যায়। পিয়াল অপুদের গিয়ে সব কথা বলে। তারা সবাই তখন দোকানে আসে এবং দোকানদারকে বলে আপনি দোকানে মাদকদ্রব্য তুলেন এবং বেচেন কেন? দোকানদার বলে এই বাচ্চারা তোদের কী সমস্যা রে? আমার দোকান আমি বেচব তোর কি। অপু বলে আপনি এই মুহূর্তে দোকান থেকে এই সব ফেলে দেন এবং আর কোনদিন এইসব জিনিস তুলবেন না। দোকানি বলে তোদের মতো ছোটদের কথা শুনব। তোরা কি জানিস? তোদের ভালো-মন্দ বুঝার বয়স হয়েছে। অপু বলে ভালো-মন্দ বুঝার বয়স হয়েছে নাকি একটু পরে বুঝতে পারবেন। ঐ যে মেম্বার আসছে আপনার বিচার করতে। পিয়ালকে আমি মেম্বারকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। আপনি আমাদের কথা শুনবেন না সেই জন্য মেম্বারকে ডেকে এনেছি। পিয়াল মেম্বার দোকানদারকে মাদকদ্রব্য দোকান থেকে ফেলতে বলে। কিন্তু দোকানদার রাজি হন না। মেম্বার সাহেব আইনের ভয় দেখালে রাজি হয়। মেম্বার সাহেব বলে আপনার মতো লোকদের জন্য কত মানুষের মৃত্যুও হতে পারে। এই মৃত্যুর জন্য আপনি দায়ী। সে ভুল বুঝতে পারে এবং অপুদের ও মেম্বারকে বলে আর কোনদিন এই সব দোকানে তুলবে না। রাতে এখন অপু শুয়ে ভাবে দেশে অনেক দোকান সেখানেও মনে হয় এই রকম মাদকদ্রব্য রয়েছে। আমরাত আজ আমাদের এলাকার মাদকদ্রব্য বেচা বন্ধ করেছি। অন্য জায়গায় মাদকদ্রব্য বেচা কে বন্ধ করবে। এই কথা ভাবতে ভাবতে অপু ঘুমিয়ে পড়ে।

আলো ও ছায়া

আব্দুর রউফ হোসেন (রাজ)

রাজিব চৌধুরীকে এমন নির্জন স্থানে এভাবে একাকী পেয়ে যাবে ভাবতেও পারেনি অনামিকা। প্রত্যাশার অতিরিক্ত পাওনা ভেবে সে উদ্বেলিত হয়। সন্তর্পনে এগিয়ে যায় তার দিকে।

গত বই মেলাতে এক বুকস্টলে দেখা হয়েছিল। নিজেকে তার ভক্ত বলে পরিচয় দিতে কুন্ঠাবোধ করেনি সেদিন। তবে বিস্মিত হয়েছিল। কারণ- 'মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি'। এতো অল্প বয়স অথচ প্রিয় কবিকে এতো কাছে থেকে দেখার স্মৃতি কি ভোলা যায়? এতদিন শুধু তার প্রিয় কবিতার প্রিয় কয়েকটি পংক্তি নিয়ে ভেবেছে। একাকীত্বের তারকারা যখন বৃষ্টির মতো কান্নার জলে বুকে মিশে গেছে তখন ব্যর্থ দৃষ্টি দিয়ে চোখ বুলিয়েছে রাজিব চৌধুরীর কবিতায়। আর কি আশ্চার্য সাথে সাথে মন ভালো হয়ে গেছে তার।

তারই মনের কথা, অব্যক্ত সুরের ব্যথা কিভাবে অন্য একজন শব্দের সাঁকোয় বেঁধে ফেলে অকৃপণভাবে। সেতো নিজেই এসব লিখতে পারতো। তবে কেন লেখেনি? মনের দেয়ালে লেখা এসব অদৃশ্য কবিতার লাইন কি তবে অজান্তে উৎসর্গ করেছে তার প্রিয় কবিকে? আর সে অকৃপণভাবে শিল্পসত্ত্বার সাথে প্রতি স্থাপিত করেছে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্তে। তার মনোভূমিতে। কিন্তু কবিতার সেই মানুষকে দেখে মনে হয়েছে এতো সূর্যের মতো প্রখরতা নয়, এতো চাঁদের স্নিগ্ধতা। কথা বলেছে সেদিন। অনেক কথা। অনেক কৌতূহল ঝপে পড়েছে ঝরা পাতার মতো। 'আবার দেখা হবে'- কথা দিয়েছিল সেদিন। কিন্তু আর হয়নি। তবে আজ অপ্রত্যাশিতভাবে হলেও দেখা হলো তাদের। মন খারাপ হলে এখানে চলে আসে অনামিকা। শহরের একটু বাহিরে প্রস্তাবিত পর্যটন কেন্দ্রে। সৌন্দর্য প্রিয় মানুষের ভোগবিলাসের মাত্রা বাড়াতে কাজ চলছে। কিন্তু প্রকৃতির অকৃপণ দানকে হত্যা করে নয়। এক মনে ঘাস ছিঁড়ছিল রাজিব। হালকা পারফিউমের গন্ধে চেতনায় ফিরে আসে সে। ভাবতে থাকে পৃথিবীর কত গন্ধইতো হাতের কাছে, দেহের কাছে। কিন্তু এসব গন্ধকে ছোঁয়া যায় না। অনামিকাও কি তাই? সেও কি সমস্তটাই সুবাস! শুধু গন্ধ দেবে- আর কিছু না! অনামিকা রাজিবের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ভূমিকা ছাড়াই বলে, "চিনেছেন?"

"আমি অনেককেই ভুলিনা।" সংক্ষিপ্ত অথচ তীর্যক উত্তর।

খুশী হলাম। "সেদিন কিন্তু বলেছিলেন এর পর যেদিন দেখা হবে সেদিন কবিতা নিয়ে কথা বলবেন।" রাজিবের বুজের ভিতর ঝর ঝর করে বৃষ্টি ঝরে। মনে মনে ভাবে আমি কি কবিতা বলবো অনামিকা? সেদিন তুমি যে প্রশ্ন করেছিলে সেটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমার কবিতায় একজনের ছায়া আছে। কিন্তু ছায়াটা কার? কেমন তার অবয়ব! বড় কৌতূহল তোমার। কৌতূহলকে কৌতূহল রাখতে গিয়েই তোমার সাথে যোগাযোগ রাখিনি। তুমি আবার আমাকে বিদ্ধ করতে এসেছ?

আরে কি ভাবছেন? সহাস্য প্রশ্ন অনামিকার।

ভাবছিলাম পেট্রোল বোমাটা এই পুকুরে প্রয়োগ করব কি না। হেসে ওঠে দুজনেই। একজনের হাসিতে নির্মল আলো ঝড়ে পরে গোলাপ ফুলের মতো। আর অন্যজনের হাসিতে মুখলুকায় ছায়া। যে ছায়ার ছায়ায় সে কবিতা লেখে। মরীচিকার মতো দিগন্তে হারিয়ে জীবন পাতার ক্যাশবাক্সকে শূন্য করে দিয়েছে। 'প্রিয়তম' থেকে হয়ে গেছে 'প্রিয়কষ্ট'। সেই 'প্রিয়কষ্ট' বর্ষার জানালায় আসে প্রতিনিয়ত। দিয়ে যায় কবিতার উপকরণ। তবে ভিতর তুমি কেনো দ্বিতীয়া হয়ে এলে অনামিকা। হয়তো তুমিও চলে যাবে একদিন। আরো একটা ক্ষত বাড়বে আমার।

"আপনার কি মন খারাপ?"

না না মন খারাপ হতে যাবে কেন?

কিছু বলছেন না যে?

কি বলব? সব কথা যদি বলেই ফেলি তাহলে লিখব কি?

সূর্য তখন ডুবুডুবু। সামনে বিশাল পুকুরের পানিতে ডিমের কুসুমের মতো সূর্যের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। রাজিব সেদিকে তাকিয়ে বলে, "তোমাকে যদি এই দুই সূর্যের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে ছবি তুলি?"

"কিভাবে? ক্যামেরা আছে?" বলে অনামিকা।

"শুধু ক্যামেরার ফ্লাশেই কি ছবি তুলতে হয়।"

"ও হ্যাঁ আপনার কলম কি ক্যামেরার চাইতে কম?"

রাজিবের বুকের ভিতর বেদনার হাহাকারে হুহু করে ওঠে।

'প্রিয়কষ্ট' এভাবেই কথা বলতো।

আমি কি আপনার স্বপ্নছায়া হয়ে কবিতার জানালায় আসতে পারি না! উচ্ছসিত হয়ে অনামিকা বলে।
ভেতরে ভেতরে নিরব কান্নার পাথর ভেঙ্গে যায় রাজিবের। আমিতো তোমাকে জানালায় দেখতে চাইনা, আমি চাই তুমি কবিতার দরজায় এসো, আম্র মুকুলের ঘ্রাণ নিয়ে। আমি রজনীগন্ধা হাতে নিয়ে বলব স্বপ্ন ছায়ার নিভৃতচারী চিত্রময়ী দ্বিতীয়া, আজ মনে হচ্ছে তুমিই ছিলে আমার প্রথমা।
হঠাৎ রাজিবের একটা হাত ধরে ফেলে অনামিকা। রাজিবও সাড়া দেয়। পাঁচ আঙ্গুল পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অজানাপুলক সঞ্চারিত করে। "আমাকে নিয়ে কবিতা লিখবে না?"
দুজনের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসে। হাত সরিয়ে নেয় দুজনেই।
রাজিব বড় করুণ দৃষ্টিতে তাকায় অনামিকার দিকে বলে 'তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখেছি দ্বিতীয়া'।
অনামিকা বিস্মিত হয়। আমাকে নিয়ে ভেবেছ তুমি। জীবনে তো আর অনেককে নিয়ে ভাবা যায় না। তবে কাউকে না কাউকে ভাবতেই হয়। বলেই আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে রাজিব।
"এখানে নিঃশব্দ অভিমানের- বৃষ্টি ঝরে ঝর ঝর করে/রিম ঝিম নেই, নেই বিদ্যুৎ চমক/তবু বেদনার পললে পাললিক হব আমি/তোমাতেই ফিরে আসবো বার বার।" এক বিবর্ণ হাসি হেসে রাজিব বলে, 'সে দিনের কথা রাখলাম'।
তিনদিন পর রাজিব অনামিকার বাসায় ফোন করে। তাকে নিয়ে যে কবিতা সে লিখেছিল সেই কবিতা একটি দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য পাতায় ছাপা হয়েছে। অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসে, "অনামিকা গতকাল রাতে আমেরিকা গেছে।" বলেই রিসিভার রেখে দেয়। রাজিবের চোখ জলে ভরে উঠে। কুয়াশার মাঝে কেউ হারিয়ে আর আসবে না সে শিশির হয়ে। অথচ গোধূলি রঙ্গের শাড়ীতে সরিষা বন থেকে তাকে চিনে নেওয়ার কথা ছিল। এখন শুধু জলদ মেঘের তীরে বালিকণার চোরাবালিতে দেখতে হবে অজানা ঘাসের রংধনু-ফুল।

A Moonlit Night
MD. ZAHIDUR RAHMAN

I enjoy such a night,
The night when the moon gives light.
And all the stars deeply twinkle in the sky.

I enjoy the night.
When the wind flows sweetly and warmly,
The moon smiles so nicely,
I enjoy the night,
That night, our living site,
Makes so bright.

I enjoy the night's sky,
During the enter nature
Full of nice firefly
I like to live everlasting,
The lovely night's sky, enjoying
Also, you may enjoy the night, hoping.

বিরহের রাত
মোহাম্মদ আব্দুর রউফ হোসেন

তুমি ছিলে একদিন, আকাশের নীল
আজ শুধু স্মৃতি, ধূসর প্রহর,
তোমার ছোঁয়া মেখে ছিলো বাতাস
আজ সে হাহাকার, নিঃসঙ্গ শহর।
তোমার কথারা ঝরে পড়ে বৃষ্টি,
ভিজিয়ে দেয় ব্যথার গলি,
চোখের কোণে স্বপ্নের ছায়া,
নীরবে বলে, "ফিরে এসো চলি।"
চাঁদের আলো জ্বলে-নেভে জানালায়,
তোমার ছায়া খুঁজি অন্ধকারে,
শূন্যতায় বাজে তবু সেই গান,
তোমারই নাম, হৃদয়ের তারে।
ফিরবে কি তুমি? এই নীরব রাতে?
নাকি হারিয়ে গেলে চিরতরে?
আমার আকাশ কাঁদে তোমার অভাবে,
বিরহের গল্প রয়ে যায় মনে...

মিলির স্বপ্ন
খালিদ হাসান রিমন

মিলি ছিল বাংলাদেশের একটি ছোট্ট গ্রামের একটি মেয়ে। সে ছিল খুবই সাহসী এবং ছিল খুবই উদ্যমী। আর সব সময় নতুন কিছু শিখতে আগ্রহী ছিল। তার গ্রামের বেশিভাগ মেয়েরা স্কুলে যেতে পারতো না। কিন্তু মিলি তার বাবা-মায়ের সমর্থনে পড়াশোনা করত এবং স্বপ্ন দেখতো বড় কিছু করার।

একদিন মিলি স্কুলে থেকে বাড়ি ফিরছিল। তখন সে দেখে গ্রামের কিছু কিশোর মেয়েরা এক গাছের নিচে বসে আছে। তাদের মুখে হতাশা আর দুঃখের ছায়া। মিলি তাদের কাছে গিয়ে জানতে চায়, "তোমরা স্কুলে কেন যাচ্ছো না"? তারা বলে 'আমাদের বাড়িতে পড়াশোনা করার কোনো অনুমতি নেই। আমাদেরকে মাঠে কাজ করতে হবে।

মিলি তাদের কথা শুনে খুব কষ্ট পেল। সে তাদের বাবা-মার সাথে কথা বলে এ বিষয়ে এবং তাদের কাছে অনুরোধ করে যে, তাদের সন্তানদেরও পড়াশোনা করতে দিতে হবে। এতে মিলির বাবা-মা তাকে সমর্থন করে এবং গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদেরকে পড়াশোনার গুরুত্ব বোঝাতে শুরু করেন।

মিলি ও তার বাবা-মা গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের পরিবারের সাথে দেখা করেন এবং তাদের জানান পড়াশোনার গুরুত্ব সম্পর্কে। তারা বলেন, পড়াশোনা করলে তারা আত্মনির্ভরশীল হতে পারে এবং তাদের জীবন সফল হতে পারে। ধীরে ধীরে, গ্রামের মানুষ তাদের কথা শুনতে শুরু করেন এবং তাদের মেয়েদের পড়াশোনার জন্য উৎসাহিত করেন।

মিলির উদ্যোগে গ্রামের অধিক মেয়েই স্কুলে যেতে শুরু করে। মিলি তাদের সাহায্য করে পড়াশোনার জন্য নতুন বই সংগ্রহ করতে এবং শিক্ষকদের সাথে সহযোগিতা করতে। তার এই উদ্যোগ গ্রামের মানুষের মধ্যে অনেক প্রশংসা পায়।

কয়েক বছর পরে, মিলি তার স্কুলের পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে এবং একটি ভালো কলেজে ভর্তি হয়। সে তার গ্রামে একটি ছোট্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে এবং সে সফলও হয়। তার সেই বিদ্যালয়ের মান ছিল অনেক উন্নত। গ্রামের মেয়েরা তার সাহায্যে শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে।

মিলি গ্রামের মানুষের কাছে উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায়। তার উদ্যোগে গ্রামের মেয়েরা শিক্ষার মাধ্যমে জীবনে উন্নতি করতে শুরু করে এবং তাদের পরিবারদের সহায়তা করতে পারে।

মিলির বিদ্যালয় থেকে শিক্ষিত হয়ে অনেক মেয়েই বড় বড় পদে কাজ করতে সক্ষম হয়। তারা তাদের পরিবারের কাছে গর্বিত। মিলির এই উদ্যোগে শুধু তার গ্রামে নয়, অন্য গ্রামেও প্রভাব ফেলে। অন্য গ্রামের মানুষেরাও মিলির উদাহরণ অনুসরণ করে এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করে।

তার এই উদ্যোগে তার গ্রাম একটি শিক্ষিত ও উন্নত গ্রামে পরিণত হয়। তার মতো সাহসী মেয়েদের জন্যই আমাদের সমাজে উন্নতি সম্ভব হয়েছে। আমরা যদি সবাই তার মতো সাহসী ও উদ্যোমী হয়ে কাজ করি, তাহলে আমাদেরও ভবিষ্যত উজ্জ্বল হবে।

বৃদ্ধ মায়ের বিষাক্ত স্বপ্ন

আমীর হামজা

অভাগীর মনের আশা কি আর এই পৃথিবীতে মিটে। একদা এক গ্রামে মা ও মেয়ের বসবাস ছিল। বাঁশের বেড়া দ্বারা ঘেরা ও খড়েরর চালিযুক্ত একটি বাড়ি ছিল তাদের। মেয়ের নাম সুভা। পড়াশোনায় সে খুব ভালো। কিন্তু পরিবারের অবস্থা খুব খারাপ। মা এক বাড়ির চাকর। কাজ করে যে পরিমাণ অর্থ পায় তা দিয়ে সংসার চালানোই দ্বায়, তার উপর মেয়ের পড়াশোনা। এক ছোট্ট ভিটা ছিল যা শেষ পর্যন্ত বিক্রি করতে হলো। সকাল পেরিয়ে সন্ধা, দিন পেরিয়ে দিন প্রায় ১০-১২ বছর পর সুভা এখন একজন বিখ্যাত ডাক্তার। তার সাথে দেখা করতে হলে এখন এক দেড় মাস আগে থেকে সিরিয়াল দিতে হয়। তার জীবন এখন খুব সুন্দর। তার একটি সুখী পরিবার আছে। যেখানে আছে ২টি ফুটফুটে বাচ্চা। সে তার জীবনের পুরনো দুঃখ ভরা সময়কে মনে করে না। তার অসময়ের সঙ্গীকেও সে আর মনে করতে চায় না। অবশ্য তার সাথে দেখা করতে বৃদ্ধাশ্রমে। যখন মেয়ে দেখা করতে আসে পাঁচ-ছয় মাস পরে, মায়ের মন আনন্দে ভরে ওঠে। তার মেয়ে যখন তাকে ফেলে চলে যায় তখন সে তার মেয়ের দিকে হাত বাড়ায় আর আবার ফিরে আসার জন্য আর্তনাদ করতে থাকে। সে ভাবে তার বিষাক্ত স্বপ্ন যেন এ পৃথিবীতে পূরণ হবার নয়।

মিনতি

মোঃ জাহিদ হাসান

বিভো, দেহ মনো বল!
পারিনা গাঁথিতে সুখের মালা,
পারিনা বলিতে মিনতির কথা,
তোমাকে দেখার সাধ জাগে,
বক্ষে জমেছে ব্যথার কথা।

বিভো, আঁধার রাতে তোমারই গান,
পাখির সুরে বাজে তোর নাম,
কিন্তু করুন বিষাদ ভাসে,
তবু তুমি রইলে অবিকল থাম।

বিভো, তোমার ছোঁয়ায় জাগে প্রাণ,
বাতাসে বাজে মৃদু ব্যথার সুর,
আমি মিনতি করি বারংবার,
তবু তুমি রইলে নিশ্চুপ দূর।

বিভো, বলো, কেন এত নীরবতা?
কেন হারিয়ে গেলে দূরের পথে?
আমি যে ডাকি, শুনো আমার ভাষা,
ভালোবাসা কি তবে ব্যথার স্রোতে?

বিভো, চাঁদের আলোয় মাজিত স্মৃতি,
দগ্ধ হৃদয়ে বাজে তার সুর,
তবু তুমি এলে না, ফিরলে না,
রইলে কেবল নিশ্চুপ দূর।

স্বপ্নের শহর
তাহমিদ হাসান

একটা শহর বানাবো, রঙিন বাতাসে,
যেখানে ক্লান্তি নেই, দুঃখও আসেনা বাতাসে।
সকাল উঠবে সোনালি আলোয়,
নদীর ঢেউ গাইবে গানের পালো।

রাস্তাগুলো হাসবে শিশুর মতো,
চাঁদে নিচে জ্বলবে প্রদীপ যত।
গাছের পাতায় গল্প লেখা,
রাতের হাওয়ার বাঁশির বেলা।

মানুষগুলো স্বপ্ন বুনবে,
তারা ভাঙবে না, কাঁদবে না হঠাৎ।
প্রতিটা মুখে ফুটবে আলো,
ভালবাসা হবে একটাই চাও।

এই শহরে থাকবি কি তুই?
ভুলে যাবি যত দুঃখের স্তুপ?
আয়, হাতে রাখ হাতখানি,
গড়ি স্বপ্নের শহর, যেখানে রাতও জানে হাসি।

২৪- এর দাবানলে-
তাহমিদ হাসান

রক্ত ঝরেছে রাস্তায় আবার,
স্লোগান ওঠে, ভেঙেছে ঘুম।
স্বৈরাচারের লোহার প্রাচীর,
ছিঁড়বে এবার, গড়বে নতুন।
মাঠ জুড়ে সব পায়ের শব্দ,
বুকে আগুন, চোখে শপথ।
ভাঙবে শাসন, থামবে অন্যায়,
এবার চুপ নয়, এবার প্রতিবাদ
তারা চেয়েছিল ন্যায়ের ভাষা,
পেল বন্দুক, পেল লাঠি।
তবু ভয় কি? মৃত্যু হাসে,
যখন তরুণ ওঠে জেগে
২৪- এ লেখা ইতিহাস,
তাদের ত্যাগেই পথের আলো।

সময়যাত্রা (সনেট)
তাহমিদ হাসান

আমি কি ছিলাম এক হারানো সময়,
নাকি সময়ই আমায় ফেলে গেছে?
স্মৃতির পাতায় পড়ে থাকা ক্ষয়,
মুছে দিল যারে, সে আর কবে বেঁচে?

ঘড়ির কাঁটা হাঁটে নির্লিপ্ত মনে,
কেউ তার ধ্বনি কি শোনে ঠিকঠাক?
কালো রাত্রি নামে দিগন্তের কোণে.
কেউ কি হারালে খোঁজে পথটাক?

অতীতের পথে কি ফিরিবো আর?
ভবিষ্যৎ কি আমায় চেনে না আজ?
নাকি আমি সময়েরই এক অবশেষ?

আমি থেমে আছি, সময় চলে যায়,
তবু পথ আমারই বুনে যায় সাজ।

“সমতার শপথ”
তাহমিদ হাসান

কোটা নয়, চাই যে ন্যায়,
স্বপ্নগুলো পিছিয়ে যায়।
মেধার পথ হোক যে মুক্ত,
বৈষম্যের দেয়াল ভেঙে যুক্ত।

শ্রম ও ঘামে গড়া আশা,
থাকবে না আর পথের বাঁশা।
সবার জন্য সমান অধিকার,
তবেই হবে শিক্ষা সবার।

কৌতুক
বুদ্ধিমান ডাকাত
তাহমিদ হাসান

একদিন এক ডাকাত ব্যাংক ডাকাতি করতে গেল। বন্দুক উঁচিয়ে বলল-
ডাকাত: সবাই টাকা বের করে দাও, নইলে গুলি চালাব!
সবাই ভয়ে টাকা বের করে দিল, শুধু এক বৃদ্ধ চুপ-চাপ দাড়িয়ে রইল।
ডাকাত: “কেন টাকা দিচ্ছ না”?
বৃদ্ধ: “আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই!”
ডাকাত একটু ভাবল, তারপর বলল-
“ভাই, খুব ভালো সিদ্ধান্ত! এই ব্যাংক তো আমি ৫ মিনিটেই ফাকা করে দিলাম, তুমিই ঠিকই বুঝেছো টাকা এখানে রাখা উচিত না।

কৌতুক
২৪- এর ছাত্র আন্দোলন
তাহমিদ হাসান

২৪ এ ছাত্র আন্দোলন চলছে। এক ছাত্র আরেক ছাত্রকে বলছে-
প্রথম ছাত্র: দোস্ত আমরা যে আন্দোলন করছি, তাতে তো সবাই লিডার হতে চায়।
দ্বিতীয় ছাত্র: হ্যাঁ, তবে এক সমস্যা হয়েছে?
প্রথম ছাত্র: কী সমস্যা?
দ্বিতীয় ছাত্র: “সবাই লিডার হতে চায় কিন্তু কেউ কাউকে ফলোই করতে চায় না!”
প্রথম ছাত্র: তাহলে তো আমাদের আন্দোলন হয়ে গেছে ফলোয়ার ছাড়া ‘লাইক’ পাওয়া আন্দোলন।

নক্ষত্রদের ঠিকানা
সাকিব

রাতের আকাশে হাটছিল একদিন,
একটি ছোট্ট আলোর দানা,
বলল চাঁদকে- "আমি হারিয়ে গেছি,
কোথায় আমার ঠিকানা?"

চাঁদ হাসলো, মিটমিট করে,
বলল- "যাও, বাতাসকে জিজ্ঞেস করো",
বাতাস বলল- "আমি তো ঘুরি,
তোমার ঘর কোথায় আমি তো জানিনা রে!"

আলোর দানাটি এল এক নদীর কাছে,
নদী বলল- "তোমার ঘর আমার বুকে নেই,
তবে আকাশের তারাদের বলে দেখ,
তারা কি তোমাকে চেনে?

তারারা তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ
একটি তারা বলল তুমি তো আমাদেরই ছেলে
তোমার ঘর এই নীলের দেশে
ফিরে এসো আমাদের দেশে আমরা জ্বলবো একসাথে।

আলোর দানা হেসে উঠল
ঝলমলিয়ে উঠল রাতের বুকে
হারিয়ে গিয়েও, সে খুঁজে পেল
তার নিজের আপন সুখে।

প্রকৃতির মায়া
মোঃ মেসবাউল হাসান

আমি চাই না কোনো কবি হতে,
চাইনা কোনো লেখক,
তবুও আমাক প্রকৃতির টানে
লেখতে হয় এসব।

নদীর কলকল স্রোতধারা
বনের সবুজ ছায়া,
পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে গিয়ে
মনে হয়, লিখতে হবে আমারও।

রাতের আকাশে ভরা তারা
চাঁদের আলোয় জ্যোৎস্না ভরা,
এমন দৃশ্য দেখে মনের ভেতর
আবেগের ঢেউ ওঠে আবারও।

আমি চাই না কোনো কবি হতে,
চাইনা কোনো লেখক.
তবুও আমাক প্রকৃতির টানে
লেখতে হয় এসব।

তিথির কর্মকান্ড

মোঃ মেসবাউল হাসান

তিথির বয়স তিন,
ব্যস্ত সারাদিন।
এডিস মশা দেখতে পড়ে
গাঁ করে ঘিনগিন।
নাচবে তো ধিন ধিন।
সে আজ খুব খুশি
তার বাবা গেছে চীন।
তিথির বয়স তিন,
ব্যস্ত সারাদিন।

ছাত্রজীবনে শীতের সকাল

মোঃ মেসবাউল হাসান

পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে,
ঠান্ডা হাওয়ায় কাঁপন লাগে,
লেপের নীচে শরীর ঢাকি,
স্কুলের চিন্তা মাথায় জাগে।

সকালের রোদে কুয়াশা মিশে,
চারপাশ জুড়ে সাদা ধোঁয়া,
মা ডাক দিয়ে বলেন, “উঠো,
আটটা বাজে, স্কুলে যাওয়া।”

কাঁপতে কাঁপতে কলসির জল,
ঠান্ডা ছোয়ায় শিহরণ জাগে,
তবু মুখ ধুয়ে ব্যাগটা নিয়ে
স্কুলের পথে রওনা লাগে।

হাঁটছি দেখি শিশির ভেজা
ঘাসের বুকে মুক্তোর দান,
বন্ধুরা আসে, বলে, "চলো,
আজকের ক্লাসে জমবে জমা।"

শীতের সকালে আলসেমি যতই থাকুক
স্কুলের গল্প দারুণ লাগে,
শিক্ষার আলো শীতকে ভুলিয়ে
জীবন গড়ে সোনার জাগে।

"শান্তি কোথায়"?

মোঃ মেসবাউল হাসান

একটি শিশুর জন্ম হলো। বাবা-মায়ের চোখে খুশির আলো, নতুন জীবনের আনন্দ। ছোট ছোট হাতে সে বাবার আঙুল চেয়ে ধরল, মায়ের কোলের উষ্ণতায় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রইল। সময় কেটে গেল। সে বড় হলো, শিখল হাঁটতে, পড়তে দৌড়াতে।

কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কাঁধে দায়িত্বের বোঝা জমতে লাগল। পড়াশোনা, ভালো চাকরি, প্রতিষ্ঠা হওয়ার দৌড়-সবকিছুই যেন এক অন্তহীন সংগ্রাম। সে ভাবছিল বড় হলে জীবন সহজ হবে, কিন্তু সহজ তো হলো না! প্রতিদিন নতুন নতুন চাহিদা, নতুন দায়িত্ব তাকে স্পর্শ করতে লাগল।

একদিন সে একটি বড় চাকরি পেল, প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে লাগল। কিন্তু রাতে ঘুম আসত না, মনের মধ্যে এক অজনা শূন্যতা। "শান্তি কোথায়?"

সে দেখল একজন ধনী ব্যবসায়ী হাসপাতালে শুয়ে আছে। তার বিলাসবহুল জীবন, দামি গাড়ি, বড় বাড়ি কিন্তু শরীর এতটাই দুর্বল যে হাঁটতেও পারে না। আর অন্যদিকে, রাস্তার ধারে এক বৃদ্ধ লোক, যার গায়ে ফাটা কাপড়, কিন্তু মুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তির হাসি। সে আকাশের তারা দেখে মুগ্ধ হয়, বৃষ্টির ফোটা গায়ে মেখে আনন্দ পায়। সে কীভাবে এত সুখী?

শিশুটি সে এখন বড় হয়ে গেছে, একদিন এক দরিদ্র বৃদ্ধের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "চাচা আপনি কীভাবে এত শান্তিতে থাকেন?"

বৃদ্ধ হেসে বলল,

"শান্তি টাকায় নয়, শান্তি আসে ভালো কাজে, সৎ পথে। তুমি যদি অন্যের জন্য ভালো কিছু করো, তাহলে তোমার মন শান্তিতে ভরে যাবে।"

সে বুঝতে পারল, এই পৃথিবী একটি ক্ষণস্থায়ী জায়গা। এখানে সম্পদ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি- সবই একসময় ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু মানুষের জন্য করা ভালো কাজ থেকে যাবে। মৃত্যুর পরও তা মানুষকে মনে রাখবে।

সে সিদ্ধান্ত নিল, এখন থেকে শুধু নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্যও বাঁচবে। মানুষকে সাহায্য করবে, সৎ পথে চলবে, ভালো কাজ করবে। ধীরে ধীরে তার মন হালকা হতে লাগল, যেন কোনো এক অদ্ভুত প্রশান্তি তাকে ঘিরে ধরেছে।

সে বুঝতে পারল, "শান্তি কোথায়" এর আসল অর্থ। শান্তি অন্যের মুখে হাসি ফোটানোর মধ্যে, শান্তি সৎ কাজের মধ্যে, শান্তি ভালোবাসার মধ্যে।

ভূতের গল্প
মোঃ সিয়াম হোসেন

লিখছি.......
আমার দাদির সাথে ঘটে যাওয়া একটি মর্মান্তিক ভূত কেন্দ্রিক গল্প। দাদি সচারচর কারো সাথে এসব গল্প করেন না। আমি অনেক জোড়াজোড়িতে বলতে রাজি হয়েছে। তিনি যেভাবে বলেছেন সেভাবে বলছি/লিখছি।
আমরা মুসলিম হিসেবে জ্বীনকে বিশ্বাস করি সেটা আমাদের আব্যশক কর্তব্য। মানব জাতির মতো জ্বীন জাতিকেও আল্লাহ স্বয়ং সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মাঝে যেমন ভালো খারাপ উভই বিদ্যমান, তেমনি জ্বীন জাতির মাঝেও রয়েছে ভালো এবং খারাপ। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা শুনে থাকি মন্দ জ্বীনের কথা, তাই অধিকাংশ মানুষের মনে এমন ধারণার জন্ম নেয় যে, তারা ভাবেন জ্বীন জাতি শুধু মানুষের অনিষ্ট করে। সত্যিই কি তাই, বা এই ধারণার কতটুকু সত্যতা রয়েছে চলুন পড়ে দেখা যাক?
সাল ১৯৯১। আমার কোল জুড়ে ঘর আলো করে এলো এক কন্যা সন্তান। সে দেখতে ছিলো ভীষণ সুন্দরী, সে আমার মেয়ে বলে গর্ব করে এ কথা বলছি তা নয়, আল্লাহকে সাক্ষি রেখে সত্যি কথা বলছি। আস্তে আস্তে সে বড়ো হতে লাগলো। কেন জানি না তার উপর নজর লাগার আমার ভয় হতে লাগলো। কেননা সে দেখতে ছিলো যেমন সুন্দর তেমনই জ্ঞানী। আমি পাঁচ বছরে তাকে হিজাব পড়া শিখিয়েছিলাম। যেন তার সৌন্দর্যের কিছুটা অংশ ঢাকা পড়ে। বিশেষ করে তার কাধের বড়ো বড়ো চুল। হিজাব পড়ার কারণে তার ছোট মুখটা বিড়াল ছানার কম মনে হচ্ছিলো না। ওর আচরণ বারো বছর পর্যন্ত প্রায় একই রকম ছিলো। আমরা সবাই ওকে নিয়ে খুব খুশি ছিলাম। আর খুশি থাকবেই না কেন? সে যতই কথা বলুক না কেন কাউকে আঘাত দিয়ে বা বেয়াদবি হয় এমন কথা তার মুখ দিয়ে বের হয়নি। কিন্তু সে যখন ১২ বছরে পা দিলো তখন তার আচরণ একেবারে পাল্টে গেলো। আমরা ভেবেছিলাম এটা হয়তো তার ১২ বছরে হরমোন এর পরিবর্তনের কারণে হয়েছে। তাই এতে আমরা পাত্তা দেইনি। আস্তে আস্তে তার আচরণ একেবারে পাল্টে গেল। সারাক্ষণ সিজদায় পড়ে থাকতো। সারাদিন আল্লাহর ইবাদত করতো। যদিও সে ছোটবেলা থেকে নামাজ রোযার প্রতি সর্তক ছিলো। ওহ আমার মেয়ের নামটা এখনো বলা হয়নি। তার নাম ছিলো পরি। পরি নামটা মূলত তার সৌন্দর্যের উপর ভিত্তি করে রাখা হয়েছে। তার আচরণের পরিবর্তন প্রথমে আমরা পাত্তা না দিলেও পরবর্তীতে এটা আমাদের মনকে নাড়া দেয়। তাই আমি তাকে বলি, মা পরি তোমার কিছু হয়েছে মা। সে বললো মা আমি সারাদিন আল্লাহর সন্দিদ্ধ্যে থাকতে ভালোবাসি। আগে কি করতাম তা ভোবো না। তার কথা শুনে মা হিসেবে আমি খুব খুশি হই। মা হিসেবে এর থেকে বেশি আর কি চাওয়ার হতে পারে। জীবন নিয়ে আমাদের কোন অভিযোগ ছিলো না, এই নিয়ে আমরা বেশ খুশিই ছিলাম।
একদিন প্রায় ২.৫ বছর পর আমার এক বান্ধবি আমার বাড়িতে আসে। সে নতুন এই শহরে বসবাস শুরু করেছে। আমি নানা বিষয় নিয়ে তার সাথে আলাপ করতে লাগলাম। কথা বলতে বলতে সে জানায় তার দুটি তোতা পাখি রয়েছে কিন্তু তারা নাকি ডিম দিচ্ছে না। এমন সময় হঠাৎ আমার মেয়ে আমাদের রুমে প্রবেশ করলো এবং সালাম দিয়ে আদবের সাথে আমার বান্ধবির খোজ খবর নিলো। আমি খুব অবাক হলাম এবং ভাবলাম আজ সূর্য কোন দিকে উঠেছে। আমার মেয়ে রুম থেকে বের হয়েছে। আবার নিজ থেকে কথা বলছে। পরি বললো আপনার তোতাকে বাড়ির ভেতর রাখবেন আন্টি। এই ঘটনার সাত-আট দিন অতিবাহিত হলো। আমার বান্ধবি পুণরায় আমার বাড়িতে এলো এবং আনন্দের সাথে জানালো তার তোতা ডিম দিয়েছে। আমি বললাম সে কোন পদক্ষেপ নিয়েছে কি-না। সে জানালো আমার মেয়ে যেমনটা বলেছে সে তেমনটাই করেছে। সে আমার মেয়েকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য ডাকতে বললো। আমি যখন পরিকে ডাকতে গেলাম সে বললো, মা তার কাজ হয়ে গেছে, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করতে বলো।
এভাবে এ কান থেকে ও কান হতে হতে অনেকেই জেনে গেল পরির এই কথা। সবাই তাদের সমস্যা নিয়ে আসতে লাগলো আমাদের বাড়ি। আমি যে ভয়টা পাচ্ছিলাম সেটাই হলো। আমরা এই সমস্যা সমাধানে বাসা বদলালাম, কিন্তু তাতেও কোন কাজ হলো না।
একদিনের ঘটনা, কয়েকজন মহিলা একটি মহিলাকে টেনে হেঁচড়ে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলো। তাকে নাকি জ্বীনে আচড় করেছে। তাকে সবাই নিয়ে এসে পরির সামনে বসালো। সে মুখ দিয়ে কেমন আওয়াজ করছিলো তার কিছুই বোঝা যাচ্ছিলো না। সে পরিকে যেন খেতে যাবে সেরকম করছিলো। পরি তাকে কিছু বললো কিন্তু সে যেন আরও বেশি পাগলের মতো করলো। এরপর পরি অনেক রেগে গিয়ে ওর হাত ধরে পুরুষালি মটা গলায় বলতে লাগলো,

কেন এই মেয়েকে বিরক্ত করছিস ছেড়ে দে নয়তো। এই পুরুষালি গলায় কথা শুনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। এরপর মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে গেল এবং পরিও আধাঅজ্ঞান হয়ে গেলো। তারপর পরি সুস্থ হলে আমি পরিকে বললাম এটা কি ছিলো। তারপর পরি কিছুক্ষণ পর আমাকে উত্তর দিলো, মা আল্লাহ যেমন আমাদের সৃষ্টি করেছেন তেমনি জ্বীন জাতিকেও সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মাঝে যেমন ভালো-মন্দ বিরাজমান জ্বীনদের মধ্যেও তেমন। তেমনই একটি ভালো জ্বীন আমার সাথে আছে। সে আমার মাধ্যমে মানুষের ভালো করতে চান। সে ক্ষতি করবে না মা। এই কথা শুনার পর আমার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যেতে শুরু করলো। অনেক কান্না-কাটি করলাম। তারপর আমি আমার মেয়েকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করলাম।

হঠাৎ একদিন, আমার স্বামীর অফিসের বস আমাদের বাড়িতে এলো। তাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিলো। তার আসার কারণ জানতে চাইলে, সে জানায় তার ছেলে নাকি খুব অসুস্থ। দেশের বিভিন্ন ডাক্তার দেখিয়েও তাকে ভালো করা যাচ্ছে না। তার মেয়ে নাকি এসব কাজ করে। আমার মেয়েকে বলে সে নিজের ছেলেকে সুস্থ করে দেওয়ার কথা বলে। প্রথমত আমার স্বামী এসবে অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে তার বসের কাকুতি মিনতি শুনে না করতে পারে নি। তারপর পরির বাবা পরিকে সব বলে তারপর পরি বলে বাবা তুমি আগে ছেলেটির নাম শুনে এসো তারপর আমি বলছি। তারপর পরির বাব তাকে নাম বললে, পরি বলে সে ব্লাক ম্যাজিক বা কালো জাদু শিখতে গিয়ে অনেক বড়ো পাপ করেছে বাবা, আমি এই কাজ করতে পারবো না। পরির বাবা তার বসকে সব খুলে বলে কিন্তু তার বস কান্নায় ভেঙে পরে। এবং বলে, তুমি ছিলে আমার শেষ আশা, দয়া করে আমার ছেলেকে তুমি বাঁচাও। পরিকে এসব বললে পরি বললো আচ্ছা বাবা আমি দেখছি কি করা যায়। তারপর সাত দিন অতিবাহিত হলো। পরি তার বাবাকে বললো, বাবা তোমার বসকে বলো আজ সন্ধ্যায় আমি তার বাড়িতে যাবো। সন্ধ্যায় আমি পরির বাবা এবং পরি সেখানে যাওয়ার জন্য রওনা দিলাম।

সেখানে গিয়ে দেখি একটি ঘরের মধ্যে ছেলেটিকে আটকে রেখেছে শিকল দিয়ে। তার বড়ো বড়ো চুল ও দাড়ির কারণে মুখটি দেখায় যাচ্ছিলো না। আমরা ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই ছেলেটি আমাদের দিকে এমনভাবে এগিয়ে এলো যেন আমাদের ছিড়ে খাবে। তারপর পরি বললো আপনারা বাইরে যান আমি না বলা পর্যন্ত ভিতরে আসবেন না। তারপর আমরা বাইরে আসলাম। ভিতরে পরি আর ওই ছেলেটি একা। ভিতরে অনেক আজব আজব শব্দ হলো যা লিখে বোঝাবার মতো নয়। তারপর পরিরর ডাকে আমরা ভিতরে গেলাম এবং ছেলেটিকে অজ্ঞান ও পরিকে আধমরা অবস্থায় পেলাম। তারপর ওকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার বললো পরির ডেঙ্গু জ্বর হয়েছে। তিন দিন পর পরি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো। ছেলেটিকে দেখতে গিয়েছিলাম একদিন সে দিব্যি সুস্থ আছে।

পৃথিবী

মোঃ সিয়াম হোসেন

এই জীবনের সকল হাসি
কান্না যদি হয়,
মায়ের মতো আমার ব্যথা
কেউ তো বুঝবে না,
স্বপ্ন পথের অন্ধকারে
থামতে যদি হয়,
হাত বাড়িয়ে বাবার মতো
কেউ তো খুঁজবে না।
আমি চলতে ভালোবাসি
ভাইয়ের পাশাপাশি
আমি দেখতে ভালোবাসি

বোনের মুখে হাসি
এত ভালোবাসা ছেড়ে, দূরে সরে থাকা
কবিতারা আছে তবু, মন বড়ো একা।

বিল্লু

মোঃ সাদমান ইসলাম

আমার বয়স তখন ১২ বছর। সবে ক্লাস ৬ এ উঠেছি। নতুন স্কুল, নতুন সহপাঠী, নতুন অভিজ্ঞতা বেশ ভালোই লাগছে। রোজ বাড়ি থেকে হেঁটে বা গাড়িতে করে স্কুলে যাওয়া, ৬-৭ ঘন্টা ক্লাস করা, আবার বাড়ি ফিরে আসা। একদিন স্কুলে থাকাকালিন নোটিশ এলো কোনো কারণে স্কুল আগামীকাল বন্ধ থাকবে। স্কুল ছুটি দেওয়ার পর বাসায় ফিরতে ছিলাম, হঠাৎ দেখি রাস্তার একপাশে ঝোঁপেঝাঁড়ে কী জেনো নড়া-চড়া করছে, ভাবলাম হয়তো সাপ হবে, কিন্তু আমার ভাবনাকে ভুল প্রমাণ করে সেখানে ‘ম্যাও, ম্যাও’ শব্দ হলো। আমি এখন নিশ্চিত যে ওটা সাপ না বিড়াল। আরো ভালো করে দেখে বুঝলাম একটা বিড়াল ছানা। আগ্রহের বসে বিড়ালটি কে বাড়ি নিয়ে এলাম। বাড়িতে এখন কোথায় রাখি, ভাবতেই দেখি বারান্দার এককোণে একটা কার্ডবোর্ড এর বাক্স, সেইটাতেই বিড়ালটিকে রাখলাম। বিড়াল ছানাটির নাম দিলাম বিল্লু। প্রত্যেকদিন আমার সকাল-দুপুরের খাবার থেকে কিছু অংশ বিল্লুকে দিতাম, আবার কখনো কখনো রান্না করা খাবার থেকে আগেই তুলে রাখতাম। বাক্সটিতে পলিথিন ব্যাগ রাখতাম সেখানেই বিল্লু তার প্রতিদিনের কাজ করত ও আমি প্রতিদিন সকাল/বিকাল তা পরিষ্কার করতাম। ভাগ্যবসত আম্মু-আব্বু কেউ বুঝতে পারত না। এভাবেই বেশ কয়েকদিন চলল। হঠাৎ একদিন আম্মু আমাকে ডাকল, আমি ভাবলাম ‘হয়তো বিল্লুর ব্যাপারে জেনে গেছে’। আমি আম্মুর কাছে গেলাম, আম্মু বলল, “আজকাল আমাদের খাবার থেকে মনে হয় কেউ খাবার খেয়ে নিচ্ছে, প্রতিদিন কম কম মনে হয়, বিড়ালের উৎপাত হয়তো বেমি হয়েছে প্রায়ই শব্দ শুনি, এখন কী করা যায়? আমার তো শুধু বিল্লুকে নিয়েই চিন্তা ধরাই পরে যাই নাকি! তা তেমন কিছু হলো না এইদিন। তারপর একদিন বিল্লু প্রচুর ডাকা-ডাকি করছিল- ‘ম্যাও, ম্যাও, ম্যাও.....!!’

আমাদের পরিবারে আবার কেউ বিড়াল-কুকুর পছন্দ করে না। আম্মু দেখি আমার ঘরের দিকেই আসছে, আমার তখন প্রচুর চিন্তা করতে লাগল, ‘কী করি, কীভাবে ওকে (বিল্লুটাকে) লুকাই, আম্মু দেখলে তো রাগ করবে, আবার বকা-ঝকাও দিতে পারে।’ আমি বিল্লুকে কার্ডবোর্ডেই লুকিয়ে রাখলাম। আম্মু ঘরে এলো দেখি ঐ কার্ডবোর্ডের দিকেই যাচ্ছে, তখন আমি বললাম- ‘ঐ দিকে যাচ্ছো কেন, কিছু তো নেই খোঁজার মতো!’

এই সময় হঠাৎ বিল্লু বের হয়ে এলো, আমার মনের অবস্থা তো বলাই যাবে না। আম্মুর তো চোখে পড়লোই আবার বিল্লু কাছে আসতে শুরু করলে আম্মুর তো রাগ মাথার চুঙ্গে, সে কী রাগ। আমাকে বলল- ‘তাইতো বলি ভাত-তরকারি কম কম কেন মনে হয়, বিড়ালটাকে কার আদেশে বা অনুমতিতে ঘরে এনেছিস!’ আমার বোঝার বাঁকি রইলনা যে কী হবে, যা ভাবলাম তাই হলো দিলো বকা ও মাইর। বলল ‘এইটাকে যেখান থেকে এনেছিস, সেখানেই রেখে দিয়ে আসবি।’

আমার প্রচন্ড মন খারাপ হলো এবং আমার মনই চাইছিল না বিল্লুকে রেখে আসতে প্রায় ৩-৪ মাস আমাদের একসাথে থাকা। পরদিন যেখানে পেয়েছিলাম বিল্লুকে সেখানেই রেখে আসলাম। আমার কাছ থেকে যেতে চাচ্ছিল না, পরে জোড় করে রেখে আসছি, রিতিমতো বলতে গেলে বুকের উপর পাঁথর চাপা দিয়ে ওকে রেখে আসছি। পরে ঐ দিক দিয়েই স্কুলে যেতাম-আসতাম ৩-৪ দিন ওখানেই বিল্লু ছিল, পেছনে পেছনে আসত আবার রেখে আসতাম। পরে আর খুঁজে পাইনি। এইটাই ছিল আমার জীবনে প্রথম পোঁষা বিড়াল। যখন কোনো বিড়ালকে দেখি আমার বিল্লুর কথা মনে পড়ে। ৩-৪ মাস বিল্লুর সাথে আমার থাকা এতো সহজে কী ভোলা যায়। তোমার কী কোনো পোষা প্রাণী বা এই রকম কোনো অভিজ্ঞতা হয়েছে বা হতে চাও?

ন্যায়ের ডাক
সজল চন্দ্র

আমরা হাঁটি স্বপ্ন হাতে,
সত্যের পথ চেয়ে,
কোটা বিভাজনের দেয়াল ভাঙতে,
ন্যায়ের আলো পেয়ে।
যোগ্যতার এই বিসর্জন আর মানা যায় না,
আমরা লড়ব শেষ পর্যন্ত,
অধিকার ফিরবে না।
কলম হাতে শিক্ষার্থীরা, রাস্তায় নেমেছে,
বঞ্চনার আগুন জ্বলে, হৃদয় দগ্ধেছে।
ভবিষ্যতের এই যুদ্ধে পিছু হটবে না কেউ,
সমান অধিকার ছাড়া,
শান্তির কি আসে ঢেউ?
আকাশ কাঁপে, স্লোগান ওঠে,
অন্যায় রুখতে হবে,
সুবিচারের দিন আসবেই,
এই শপথ রবে!

আবু সাইদের ডাক
আব্দুল্লাহ আল বাকী

তুমি ছিলে স্বপ্নের দ্বীপ, এক সাহসী কণ্ঠ,
ন্যায়ের জন্য লড়াই করে জাগালে নতুন আলো।
শিক্ষার মঞ্চে, ন্যায়ের পথে, আনলে তুমি সত্য,
অধিকার ফেরাতে দিলা প্রাণ, হলে সংগ্রামের ঢালো।

তোমার চোখে জ্বলেছিল আশার দীপ্তি,
তোমার কথায় গর্জেছিল গণনার স্রোত।
সুবিচারের জন্য ছুটেছিলে তুমি,
ছিলে অবিচল, অটল, মহৎ।

কোটি প্রাণের মিছিল জাগে,
তোমার স্বপ্নকে বাচিয়ে রাখতে,
তুমি গেলে, তবু থাকবে চিরকাল,
সত্যের পথে, ইতিহাস রচিতে।

কোটা চাই না, ন্যায় চাই

আব্দুল্লাহ আল বাকী

মেধার পথে বাঁধা কেন?
স্বপ্নগুলো চাপা কেন?
অন্যায় যে সহ্য নই,
সমতার দীপ জ্বলবেই তাই।

শিক্ষা সবার সমান হোক,
ভাগ্যের শিকল ভাঙুক লোক,
ন্যায়ের দাবী, সংগ্রাম তবু,
জিতবে মানুষ, জিতবে স্বপ্নের রঙিন ঢেউ।

জ্ঞানের লাইব্রেরি

মোঃ আমিনুল ইসলাম (বাতেন)

বই কথা বলে নিজের ভাষায়,
নিজের জ্ঞানের ছাপ রেখে যায়
পাতায় পাতায়।
নিজের চোঁখে স্বপ্ন দেখায়,
নিজের মুখে কথা বলায়,
এবই না যানি কী কী বলে
ও দেখিয়ে যায়।
কখনো পড়লে কোনো বিপদে,
বই আমাদের পথ দেখায়
সাথে সাথে,
বই বন্ধু, বই সঙ্গী, বই আমাদের
জ্ঞানের লাইব্রেরি।

মা

মোঃ আমিনুল ইসলাম (বাতেন)

মা কথাটি বড় মধুর
শুনতে ভালো লাগে
আমার মায়ের মধুর হাসি
দেখতে ভালো লাগে।
ভালো লাগে প্রকৃতি
আর মায়ের আদর-যত্ন

তাইতো এবার হয়ে উঠব
মায়ের যত্নে-রত্ন।
কোনো কিছু ভয় করি না
মায়ের ছায়ায় থাকলে
করব এবার বিশ্ব জয়
মায়ের আর্শীবাদে।

বন্ধু

মোঃ আমিনুল ইসলাম (বাতেন)

বন্ধু মানে হাজার বৃষ্টির পর
শরৎকালের আকাশ,
বন্ধু মানে বইতে থাকা
ভালো থাকার বাতাস।

বন্ধু মানে তোর কী হয়েছে?
সত্যি করে বল,
বন্ধু মানে ধুর, কিছু হয়নি
আবার নতুন করে শুরু করি চল।

তুমি

মোঃ আমিনুল ইসলাম (বাতেন)

দেখে ছিলাম তোমায় চিন্তে পারি নি
দেখে ছিলাম তোমায় চিন্তে পারি নি
ভালো তো বেসে ছিলাম
বলতে পারিনি

নীল রং তোমার প্রিয় ছিল
জানতে পেরেছিলাম তাই
বাবার কাছে আবদার ছিল
নীল রঙের শাড়ী চাই।

লাল গোলাপ তুমি দিয়েছিলে বটে
নীল রঙে বদলে গেছে
আমার মনে তোমার ভালোবাসা
সবই ছিল মিছেমিছে।

রাতের আকাশে চাঁদের আলো
দিনের আকাশে সূর্য

আমার কাছে সবচেয়ে দামি
তোমার সৌন্দর্য।

তোমার জন্য রাত জাগতাম
এখনও জেগে থাকি
এখন তো তোমার জীবনে
অন্য রাত জাগা পাখি

তোমার গল্পে সবাই ভালো
খারাপ শুধু আমি
আমার গল্পে খারাপ সবই
ভালো শুধু তুমি।

বন্ধুত্ব

মোঃ সাকিব হাসান বাপ্পী

বন্ধু মানে ভালোবাসা
বন্ধু মানে রাগ
বন্ধু মানে কান্না হাসির
সমান সমান ভাগ।

বন্ধু মানে মুখে হাসি
চোখের কোণে জল।
বন্ধু মানে হঠাৎ হঠাৎ
এসএমএস বা কল।

বন্ধু মানে বন্ধন অটুট
প্রাণ খুলে কথা বলা।
বন্ধু মানে মুক্ত আকাশ
আর সবুজ ঘাসের উপর,
খালি পায়ে হেঁটে চলা।

বন্ধু মানে উষ্ণ পরশ
অনেক চেনা কেউ।
বন্ধু মানে মরুর বুকে
উত্তাল জলের ঢেউ।

বন্ধু মানে শত কষ্টের
একটি হাসি মুখ।
বন্ধু মানে পরম মিলন
অসীম কোনো মুখ।

বন্ধু মানে
No thans ×, No sorry ×
Only গালাগালি

বন্ধু নামের কোনো পদবি নেই
বন্ধুর ঠিকানা হাত বাড়ালেই।

স্বপ্নের শিক্ষক

মোঃ সাকিব হাসান বাপ্পী

শিক্ষক মানে শিক্ষা গুরু
মোদের জ্ঞানের দাতা।
অন্ধকারে আলোর দিশা
জ্ঞান জগতের ত্রাতা।

শিক্ষক মানে সবুজ মাঠে মোদের খেলার সাথি
মোদের হাতে দিলেন তিনি জ্বয়ের বাতি।
শিক্ষক মানে মানুষ গড়ার আসল কারিগর
মোদের কাছে তিনি হলেন খাঁটি পরশপাথর।

শিক্ষক মানে মোদের কাছে সুখ-দুঃখের বন্ধু
বিশ্ববাসীর প্রাণে তিনিই মণিমুক্তর সিন্ধু।
শিক্ষক মানে নিয়মনীতি মেরুদন্ড সোজা
চলার পথে উড়িয়ে দেওয়া
আদর্শেরই ধ্বজা।

বসন্ত

মোঃ সাকিব হাসান বাপ্পী

আমের বনে এসেছে মুকুল,
কোকিল গেয়েছে গান।
সকাল সকাল গান শুনে তাই,
জুড়িয়ে ওঠে প্রাণ।

শিমুল গাছে ফুল ফুটেছে,
প্রজাপতিরা তাই খুশি।
প্রকৃতির এই রূপ দেখে,
আনন্দেতে ভাসি।

শুকনো ডালে এসেছে প্রাণ,
বসন্ত দিয়েছে ধরা।
রঙিন ফুল ফুটেছে দেখো,
তাই খুশিতে আত্মহারা।

স্বপ্নের রূপায়ন

জোবায়ের হাসান

ছেলেটির নাম সজীব আহম্মেদ। তার বাবার নাম ছিল আব্দুল রহমান এবং মায়ের নাম ছিল হাসি বানু। সজীবের একটি বড় ভাইও ছিল। তার নাম ছিল আশিক আহম্মেদ। সজীব এবং আশিকের বাবা একজন বেসরকারি অফিসের স্বল্প বেতনে কর্মকর্তা। তাদের মা একজন গৃহীনি। তাদের মা-বাবার ইচ্ছে সজীব এবং আশিককে বড় অফিসার বানাবে। তারা চায় তাদের ছেলেরা যেন প্রতিষ্ঠিত এবং সম্মানিত মানুষ হিসেবে পরিচিত হয়। আশিকের স্বপ্ন ছিল তার মা-বাবার স্বপ্ন। সে বড় হয়ে একজন সরকারি অফিসার হতে চায়। তাই সে তার পড়াশোনা মনোযোগ দিয়ে করতে থাকে। সব সময় সে ক্লাসে ফাস্ট হতো। বিভিন্ন সৃজনশীল পরীক্ষায়ও সে জয়ী হতো। কিন্তু তার ছোট ভাই সজীবের পড়াশোনার উপর একটুও মনোযোগ ছিল না। সে সারাক্ষণ ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। ক্রিকেটের যাবতীয় নিয়ম-কানুন তার একেবারে মুখস্ত ছিল। তার ক্রিকেট খেলার কৌশল অত্যান্ত বিস্ময়কর। সে বেশি ভালো ব্যাটিংয়ে। তার ব্যাট করার কৌশল খুবই চমৎকার। তার স্বপ্ন বড় হয়ে সে একজন বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় হবে। যেহেতু সজীব সারাদিন ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত থাকতো সেহেতু স্কুলের পরীক্ষায় সে অকৃতকার্য হয়। এর ফলে সজীবের বাবা সজীবের উপর খুবই রাগান্বিত হন। তার বাবা তাকে অনেক বকাঝকা এবং মারধর করে। সজীবের বাবা সজীবের খেলা বন্ধ করে দেন। তাকে শুধু পড়াশোনা করতে বলেন। কিন্তু সজীব তাও পড়তে বসে না। বরং যদি পড়তে বসে তাহলে তার শ্রেণির পড়া বাদ দিয়ে ক্রিকেট খেলার সাথে সম্পর্কিত বই পড়ে। তার বড় ভাই আশিক পড়তে বললে সজীব তারও কথা শোনে না। সজীব এবং আশিককেজ তার বাবা টিউশনে ভর্তি করে দেন। যাতে তারা পরীক্ষায় আরো বেশি নাম্বার তুলতে পারে। আশিক নিয়মিত টিউশনে গেলেও সজীব নিয়মিত টিউশনে যায় না। সজীব বাড়ি থেকে প্রতিদিন টিউশনের কথা বলে বের হলেও সে টিউশনে যায় না বরং সে মাঠে ক্রিকেট খেলতে চলে যায়। এরকম একদিন, দুদিন করে চলতে থাকে। হঠাৎ একদিন সজীবের বাবা সজীবের কর্মকান্ড জানতে পারেন। সেদিন সজীবকে তার বাবা অনেক মারধর করেন। এসব দেখে সজীবের মা সজীবকে ভালো করে বোঝাতে গেলেন। তখন সজীব তার মাকে বলে যে আমি পড়াশোনা করবো না, আমার দ্বারা পড়াশোনা সম্ভব নয়। আমি একজন বড় এবং বিখ্যাত ক্রিকেটার হতে চাই। তখন সজীবের মা সজীবের পড়াশোনা না করা কারণ বুঝতে পারেন। তখন তিনি সজীবের বাবার সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলেন। তখন সজীবের বাবার একটাই কথা আমার ছেলেদেরকে আমি বড় অফিসার বানাবো। আমার মতো বেসরকারি অফিসে স্বল্প বেতনে কাজ করতে দেব না। সজীবের মা যতই সজীবের বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন ততই সজীবের বাবা একই কথা বলেন। তখন সজীবের মা আর কিছু বললেন না, ভাবলেন পরে সজীবের বাবা নিজেই নিজের ভুল ধারণা উপলব্দি করতে পারবেন। সজীব এবং আশিকের টিউশনে আর ১ দিন পর ইংরেজি বিষয়ে পরীক্ষা। পরীক্ষার দিন সজীব এবং আশিক উভয় সেই পরীক্ষা দেয়। আশিক বরাবরের মতোই সে পরীক্ষায় সবার থেকে বেশি নাম্বার পায়। কিন্তু সজীব পায় শূন্য। কারণ সজীব পরীক্ষায় যেগুলো ইংরেজি প্রবন্ধ, রচনা, গল্প ইত্যাদি আসে এগুলো সে ইংরেজিতে পড়তে পারতো না। যার ফলে সে এগুলো মুখস্তও করতে পারেনি। যার কারণে পরীক্ষায় ফেল করে। সজীবের এভাবে প্রতিটি টিউশনের পরীক্ষায় ফেল করার কারণে সজীবের টিউশনের শিক্ষক তার বাবাকে ফোন করে টিউশনে আসতে বলেন। সজীবের বাবা কাজ শেষ করে সজীবের টিউশনের গেলেন। সজীবের শিক্ষক টিউশনে সজীবের অবস্থা সম্পর্কে বললেন। তিনি বলেন সজীবের পড়াশোনার উপর একটুও আগ্রহ নেই। সে টিউশনে এসে পড়াশোনা বাদ দিয়ে শুধু ক্রিকেট নিয়ে ভাবতে থাকে। এই কথা শুনে সজীবের বাবার মুখ রাগে লাল হয়ে গেল। তিনি শিক্ষককে বললেন সজীবকে আরেকটি সুযোগ দিতে। তিনি বললেন আগামীকাল সজীব ঠিকমতো পড়া করে এসে পরীক্ষা দেবে এবং পাস করবে আমি কথা দিচ্ছি। সজীবের শিক্ষক তাকে আশ্বস্ত করে বলেন সজীবের দ্বারা পড়াশোনা হবে না। সে খুবই ক্রিকেট খেলার পাগল। তাকে

বরং একটি ভালো ক্রিকেট ক্লাবে ভর্তি করে দিন। সে খুব ভালো খেলবে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু সজীবের বাবা কোন কথা না শুনে আবার একই কথা বলে চলে গেলেন। বাড়ি এসে সজীবকে ডেকে খুব বকাঝকা এবং মারধর করেন। তারপর তাকে পড়তে বসতে বলেন। সে কিছু না বলে চুপচাপ পড়তে বসে। তার বড় ভাই আশিক আগামীকাল পরীক্ষায় আসতে পারে এমন ইংরেজি প্রবন্ধ, রচনা, গল্প, সংলাপ ইত্যাদি তাকে বইয়ে দাগ দিয়ে সেগুলো সজীবকে পড়তে বলে। কিন্তু সজীব ইংরেজী প্রবন্ধ, গল্প, রচনা, সংলাপ ইত্যাদি কিছুই মুখস্ত করতে পারছিলো না। একবার, দুবার পড়েই ভুলে যাচ্ছিল। তার বড় ভাই তাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয় এবং সেই ইংরেজি প্রবন্ধ, রচনা, গল্পগুলো পড়ে শোনায়। তবুও সে একবার দুবার, তিনবার পড়ে সে আর পড়তে পারে না। বার বার চেষ্টা করার পরও সে কোন কিছুই মুখস্ত করতে পারছিল না। তার বড় ভাই তাকে অনুরোধ করে বললো ভালো করে পড় ছোট তা না হলো বাবা এসে আবার তোকে মারধর করবে। সে রাগ করে তার প্রিয় ক্রিকেট দল বাংলাদেশ এর সম্পর্কে বলতে লাগে তাও আবার ইংরেজিতে। একের পর একটা পর্যায়ক্রম অনুযায়ী শুদ্ধ ইংরেজিতে বললো কোনো ভুল ছাড়ায়। এটা শুনে তার বড় ভাই অবাক হয়ে যায়। তার ভাইও তখন বুঝতে পারে সজীব পড়াশোনায় জিরো হলেও ক্রিকেট খেলায় সে নাম্বার ওয়ান। কিন্তু সজীবের এই খেলার সাথে সম্পর্কিত ইংরেজি শুনে তার বাবা ভীষণ রেগে গেলেন। আবারও সজীবকে মারতে শুরু করলেন। এবার সজীব একটু রেগে গিয়ে বললো আমার দ্বারা পড়াশোনা হবে না। আমি পড়াশোনা করতে চাই না। আমি ক্রিকেট খেলতে চাই। আমি বড় একজন ক্রিকেট খেলোয়াড় হতে চাই। আমাকে দিয়ে জোর করে পড়াশোনা করে নিচ্ছো কেন? আমি চাই না পড়াশোনা করতে। এবার একথা শুনে সজীবের বাবা সজীবের উপর আরো বেশি রেগে গেলেন। তাদের মধ্যে এবার তর্ক-বির্তক শুরু হলো। আশিক তখন তাদের দুজনকে থামাতে না পেরে মাকে ডাকতে চলে যায়। মা তখন বাড়ি থেকে একটু দূরে তার ছোট বেলার বান্ধবীর বাড়িতে যায়। তার নিজ বাড়িতে এত কিছু হয়ে যাচ্ছে সে সর্ম্পকে তিনি কিছুই জানেন না। আশিক দ্রুত এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেল। আশিক ও তার মা বাড়িতে পৌঁছে দেখেন সজীব মেঝেতে পড়ে আছে এবং মাথার পেছনের দিক থেকে রক্ত বের হয়ে আসছে। কারণ সজীবের বাবা যখন সজীবের এমন আচরণ দেখে আরো বেশি রেগে গিয়ে মারধর শুরু করলে সজীব তখন মার খাওয়ার হাত থেকে বাঁচতে পেছনে দিকে যেতে থাকে। হঠাৎ তার পা পিছলে যায় এবং তার মাথার পেছনের অংশ বিছানার কোণায় যে শক্ত কাঠ থাকে তার সাথে গিয়ে লাগে আর তারপর সে মেঝেতে পড়ে যায়। সজীবের রক্তাক্ত অবস্থা দেখে সজীবের মা ও তার বড়ভাই সহ তার বাবাও কাঁদতে শুরু করে। তাদের জোরে কান্নার আওয়াজ শুনে আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে দেখে সজীবের এই অবস্থা। তারা তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডাক্তার তখনই তাকে দ্রুত ICU তে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করেন। চিকিৎসা শেষ করে এসে ডাক্তার বললেন সে বেঁচে আছে কিন্তু মাথায় জোরে আঘার লাগার কারণে অনেক রক্ত বের হয়ে যায় ফলে সে কোমায় চলে গেছে। এ কথা শুনে সজীবের মা, বাবা, ভাই কান্নাকাটি শুরু করলো। ডাক্তার আরও বললেন চার মাসের মধ্যে একটা বড় অপারেশন করলে সে হয়তো স্বাভাবিক হতে পারে। এবার তারা একটু শান্ত হলো। ডাক্তার সজীবকে ২টি ইনজেকশন করলেন এবং তিনি কিছু ঔষধ লিখে দিলেন এবং সজীবকে বাড়িতে নিয়ে যেতে বললেন। সজীবের বাবা ঔষধ কিনে সজীবকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। এরকম করে ১দিন, ২দিন, ৩দিন করে চলতে থাকে। কারো মুখে হাসি নেই, খাওয়া-দাওয়াও কেউ ঠিকমতো করে না। আশে-পাশের প্রতিবেশীরা তাদেরকে অনেক শান্তনা দিল। সজীবের বাবাকে তার কাছের প্রতিবেশী এবং সহকর্মীরা তাকে আগেই বলেছিল যে তোর ছোট ছেলে সজীবকে দিয়ে পড়াশোনা হবে না। সে ক্রিকেট ভালো খেলতে পারে। তাকে একটি ভালে ক্রিকেট ক্লাবে ভর্তি করে দেও। কিন্তু তখনও সে তাদের কথা শোনে নি। এখন সে তার ভুল বুঝতে পারছে। সে উপলব্ধি করতে পেরেছে যে তার একটি বিরাট বড় ভুল হয়েছে। যার কারণে সজীবের আজ এমন অবস্থা সজীবের মা এই কথা শুনে তিনি বললেন তোমাকে আগেই বলেছিলাম যে আমাদের সজীবকে দিয়ে পড়াশুনা হবে না। সে ক্রিকেট খেলোয়াড় হতে চায়, তাকে তুমি একটি ভালো ক্লাবে ভর্তি করে দেও। তখন আমার একটা কথাও শোননি। তাই আজ আমার ছেলের এই অবস্থা। আরে সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না। কেউ পড়াশোনায় ভালো, কেউ গায়তে ভালো, কেউ খেলাধুলায় ভালো, কেউ আবার নাচতে ভালো। এগুলো হচ্ছে ছেলে-মেয়ের প্রতিভা। আর তুমি আমার ছেলের প্রতিভাকে মাটিতে পুঁতে দিয়েছো। সজীবের বাবা নিজের ভুল স্বীকার করে এবং সংকল্প করে সে তার ছোট ছেলেকে একজন নামকরা খেলোয়াড় বানাবে। তার ছেলে সুস্থ হয়ে উঠলে তাকে ক্রিকেট ক্লাবে ভর্তি করে দেবে। তাকে আর পড়াশোনার জন্য জোর করবেন না। সজীবের পরিবার সৃষ্টিকর্তা কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা করে যাতে সজীব সুস্থ হয়ে উঠে। চার মাস পর আজ সজীবের অপারেশনের দিন। সবার মুখে হতাশার ছাপ। সবই সৃষ্টিকর্তাকে

ডাকছে। ডাক্তার অপারেশন থিয়েটারে অপারেশন করছেন। সৃষ্টি কর্তা সজীবের পরিবারের প্রার্থনা শুনেছেন। অনেক্ষণ পর ডাক্তার এসে বললো অপারেশন সফল হয়েছে। সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমতে সে এখন বিপদ মুক্ত। কিন্তু সে এখনো অজ্ঞান। জ্ঞান ফিরলেই আপনারা তার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। এই বলে ডাক্তার চলে গেলেন। এই কথা শুনে সজীবের পরিবারে খুশির ঢল নেমে আসলো। তারা সৃষ্টিকর্তার কাছে অনেক কৃতজ্ঞতা জানালো। সজীবের পরিবারের কাছে আজ একটা বড় উৎসবের দিন। অনেকক্ষণ পর সজীবের জ্ঞান ফিরলো। সে আস্তে আস্তে নিজের হাত, পা, নাড়াচ্ছে। কিছুদিন হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার পর তাকে বাড়িতে আনা হলো। তারপর বাড়িতে তাকে নিয়ে এসে ডাক্তাররের কথা মতো সজীবের পরিবার সজীবকে সেই অনুযায়ী সেবা যত্ন করলো। এরপর সজীব সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে গেল। সজীবের বাবা আব্দুল রহমান এবার সজীবের হাতে বই, খাতা, কলমের বদলে ব্যাট, বল ও ক্রিকেটের সরঞ্জাম তুলে দিলেন এবং তাকে একটি ভালো ক্রিকেট ক্লাবে ভর্তি করে দেন। সজীব তার দক্ষতা দিয়ে খেলতে শুরু করে। খেলতে খেলতে সজীব সেই ক্লাব থেকে একটি বড় এবং বিখ্যাত ক্রিকেট টিমে খেলার সুযোগ পায়। সেই টিম অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে খেলে। সজীব সেখানেও খেলার সুযোগ পায়। কোচ তার খেলা দেখে এতই খুশি হন তাকে সে টিমের অধিনায়ক করে দেন। বাহিরের দেশের সঙ্গে সে খুব দক্ষতার সাথে খেলে এবং তার টিমকে জিতিয়ে দিয়ে নিজে টিমকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করে দেয়। তার এ অসাধারণ খেলা দেখে অন্যান্য দেশ থেকে সজীবের কাছে ডাক আসতো। সজীবকে তাদের দেশের হয়ে খেলার জন্য তারা অনুরোধ করতো। এখন সজীব বিশ্বের অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়।

অপরদিকে আশিক তার পড়ালেখা শেষ করে অনেক ডিগ্রী অর্জন করে। বর্তমানে সে একজন সরকারি অফিসার। তারা দুজনেই তাদের স্বপ্নপূরণ করতে পেরেছে।

তাই বলা হয়, সব মানুষকে দিয়ে সব কাজ হয় না। যে যেকাজে পারদর্শি তাকে সেই কাজে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

যৌথ অভিনয়

মোস্তাকিন

ফজু মিয়া: (ক্যকাতে ক্যকাতে ফজু মিয়ার আগমন)

মাস্টারের অভিমন: আরে ফজু মিয়া না, তা ক্যকাচ্ছ কেন, তোমার অসুখ নাকি?

ফজু মিয়া: হয় মাস্টের, হয়। হামার ভিষন অসুখ। হামি কী আর বাঁচমু, মাস্টের হামি আর বাঁচুম না।

মাস্টার: তুমি ঔষধ খাওনা ফজু মিয়া?

ফজু মিয়া: তুমি কনকি? দুনা খানো মাস্টের দুনা খানো। কিছুই হয় না। শেষে চলটা প্রামানিক হামাকি তুমি বগুড়া কালবাড়ের ওটি যাও।

মাস্টার: (হাসিমুখে) আরে কালবাড নয় ওটি গিলবাড হাসপাতাল।

ফজু মিয়া: ঐ, একেই কথা।

মাস্টার: সেখানে গিয়েছিলে? তা ডাক্তার সাহেব তোমাকে দেখে কি বললেন?

ফজু মিয়া: ডাক্তার হামাকি দেকে কলো, তোমার প্যাট এক্সফেল করা লাগবি।

মাস্টার: এক্সফেল নয় ফজু মিয়া, এক্সরে করতে বলেছে।

ফজু মিয়া: ডাক্তার এক্সফেল করা হামাকি কলো তোমার পাকিস্থানত ঘা হছে।

মাস্টার: আরে পাকিস্থান নয়, ফজু মিয়া পাকস্থলিতে ঘা হয়েছে।

ফজু মিয়া: (ঐষধের শিশি বের করে) ডাক্তার শিশি দিলো আর কলো, এডা খাওয়ার আগে ঝুকা খাবা। তুমিই কন, মাস্টের হামি অসুখ লিয়া ঝুকপার পারুম।

মাস্টার: (বিরক্ত হয়ে) ডাক্তার সাহেব তোমাকে ঝুকতে বলেন নাই, ঔষধ, ঝুকিয়ে খেতে বলেছে।

ফজু মিয়া: ডাক্তার হামাকি কলো তোমার শরীর দুর্বল লিত্তি একটা করা ডিম হাফফেল করা খাবা।

মাস্টার: কী আর বলব, ডাক্তার ডিম হাফফেল নয় ডিম হাফ বয়েল করে খেতে বলেছে।

ফজু মিয়াঃ ডাক্তার টেকা লিলো আর কাগজ দিয়া কলো এগলা খাবা তোমার অসুখ থাকপার লয়। সব মিছা কথা মাস্টের, সব মিছা কথা। পেটের ব্যথার চোটে ড্রেনের পানি দিয়া গোটা কাগজ কানো। কুনটি বিসতো কমলই না আরো বেশি হলো।

মাস্টারঃ (রাগের সুরে) এজন্যই তো বলে মুর্খেও অশেষ দোষ।

ফজু মিয়াঃ (রাগ করে) তুমি যে, কি কন মাস্টের হামার গাওত আবার অশ কুনটি? খালি পেট বিশায়। আর পেটের ভিতর পায়খানা।

মাস্টারঃ (উপস্থিত লোকদের লক্ষ করে) সম্মানিত সুধী, নিশ্চয় আপনারা লক্ষ করেছেন ফজু মিয়ার টাকার কোন অভাব নেই। শুধু মাত্র শিক্ষা না থাকায় তার আজ এই অবস্থা আসুন আমরা শপথ করি যে আমরা সবাই শিক্ষা গ্রহণ করব।

হাসির কৌতুক

মোহাঃ তৌফিকুল ইসলাম

বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি- ৬ষ্ঠ সেমিস্টার

প্রতিযোগী, এনটিভি হা-শো, সিজন- ৭

১। আমার বন্ধু আমাকে একদিন বললো, "পেঁয়াজ হলো একমাত্র খাবার যা মানুষকে কাদায়।" এটা শুনে আমি ওকে ভুল প্রমাণ করলাম। আমি ওর মাথায় ডাব ছুড়ে মারছিলাম।

২। একদিন আমি আমার টাক মাথার আঙ্কেলকে বললাম, "আঙ্কেল আপনাকে কালো কাপড়ে খুব সুন্দর লাগবে।"
আঙ্কেলঃ কেন?
আমি : না মানে, ব্যাকগ্রাউন্ড কালো হলে তো চাঁদকে সুন্দরই লাগবে।

৩। বিদেশে লোকে যখন নতুন বাচ্চা দেখতে যায়ঃ Wow, so sweet baby! How cute!
বাংলাদেশে লোকে যখন নতুন বাচ্চা দেখতে যায়ঃ বাবুর নখ দাদুর মতো হইছে, ঠোঁট চাচার মতো হইছে, নাক বাবার মতো হইছে, গাল মায়ের মতো হইছে।

৪। সেদিন ইন্টারনেটে দেখি একটা খবরের হেডলাইন, "একসাথে ১৩ সন্তানের মুখ দেখলেন শাকিব খান" আমি ভাবলাম একসাথে ১৩ সন্তান, কেমনে সম্ভব? বিস্তারিত পড়ে বুঝলাম ওনার বাড়ির মুরগীর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হইছে।

৫। জীবনে পজিটিভিটি খুঁজুন।
আমি এতটাই পজিটিভ যে এমসিকিউ এর সব উত্তরই ঠিক মনে হয়।

৬। আমার বন্ধু একটা বিড়াল কিনে আমাকে দেখাতে আনলো।
আমিঃ আরে, কুকুরের সাথে কি করিস?
বন্ধুঃ ভাই ভালো করে দেক। এটা কুকুর না, এটা বিড়াল।
আমিঃ আমি প্রশ্নটা তোকে করি নি।

৭। বিশ্বের সব ফুটবলারদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা সবাই একসাথে একই বলের পিছনে দৌড়ান এই বিষয়টা ভালো দেখায় না। টাকা পয়সা তো ভালোই কামান। সবাই একটা করে বল কিনলেই হয়।

৮। সেদিন আমার অফিসের বস একটা নতুন গাড়ি নিয়ে এলো।
আমি: স্যার, গাড়িটা খুব সুন্দর।
বস: দেখো, তুমি যদি পরিশ্রম করো, দিলে ১০ ঘন্টা কাজ করো, কাজের প্রতি ডেডিকেটেড থাকো, তবে এমন সুন্দর গাড়ি আমি আরেকটা কিনতে পারবো।

৯। এলাকার বড়ভাই আমাকে উপদেশ দিচ্ছে: এমন একটা মেয়ে খোঁজ যে তোকে ভালোবাসবে, এমন একটা মেয়ে যে তোর সেবা করবে, এমন একটা মেয়ে যে তোর জন্য উপার্জন ও করবে।
আমি: হ্যাঁ, ভাই। শুধু খেয়াল রাখতে হবে এই তিন মেয়ে অপরকে দেখে না ফেলে।

১০। এক ফুড রিভিউয়ার গেছে রাস্তার পাশের এক দোকানে।
ফুড রিভিউয়ার: ভাই, শুনলাম আপনার লেগপিস খুব ভালো।
দোকানদার: আমার না ভাই, মুরগীর লেগপিস।

১১। স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমার বাবাকে ফোন দিয়েছে।
প্রধান শিক্ষক: আপনার ছেলে স্কুলে অনেক দুষ্টুমি করে।
বাবা: সেইজন্য কল করতে হবে? ও তো বাড়িতেও অনেক দুষ্টুমি করে। আমি কি কখনো আপনাকে কল করে কমপ্লেইন করছি?

১২। এক লোক মোটরসাইকেল চালানোর সময় তাকে পুলিশ আটকালো।
পুলিশ: আপনাকে কেন আটকানো হয়েছে জানেন?
ভদ্রলোক: কেন?
পুলিশ: আপনার বউ ৩ কিলোমিটার পিছনে পড়ে গেছে।
ভদ্রলোক: তাই তো বলি এত শান্তি লাগে কেন।

১৩। একদিন বন্ধুর সাথে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ৫০০ টাকার নোট পড়ে থাকতে দেখলাম।
বন্ধু: ভাই দেখ ৫০০ টাকা। চল কিছু খাই।
আমি: পাওয়া টাকা গরীবকে দিতে হয়। খেতে হয় না।
বন্ধু: তো তুই নিজের পকেটে ঢোকাচ্ছিস কেন?
আমি: আমাকে দেখে কি তোর জমিদার মনে হয়?

১৪। ছেলে: মা, আমি রেজাল্ট আনতে গেলাম।
মা: এইবার যদি তোর রেজাল্ট খারাপ হয়, তবে আমাকে আর মা ডাকতে পারবি না।
রেজাল্ট আনার পর,
মা: কিরে তোর রেজাল্ট কেমন হলো?
ছেলে: মাথা গরম করাবে না। তুমি আমার মা হওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছ।

১৫। ফায়ার সার্ভিসের ইন্টারভিউ চলছে,
ইন্টারভিউয়ার: মনে করেন একটা বিল্ডিংয়ের ২২ তলায় আগুন লাগছে। লিফট ও বন্ধ। আপনি কিভাবে আগুন নিভাবেন।
আমি: ফু দিয়ে।
ইন্টারভিউয়ার: ফু দিয়ে আগুন কিভাবে নিভবে?
আমি: আপনি বললেন মনে করেন আগুন লাগছে। তো আপনি ও মনে করেন ফু দিয়ে আগুন নিভে গেছে।

১৬। ছেলে: যাই হয়ে যাক, আমি স্কুলে যাব না।
বাবা: স্কুলে না গেলে কিভাবে চলবে।
ছেলে: এত বড় স্কুল। আমাকে ছাড়া চলবে না?

১৭। ডাক্তার: সরি! আপনারা আসতে দেরি করে ফেলেছেন।
ছেলে: না না। বাবা আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পারে না।
ডাক্তার: না না। আপনার বাবা ঠিক আছে। আসলে কাল আমাদের হাসপাতালে হার্ট অ্যাটাকে ৭০% ডিসকাউন্ট ছিল।

১৮। পৃথিবীতে সবথেকে বেশি সম্মান পায় কে?
ওয়াইফাই এর সমস্যা হলে ঠিক করতে আসা লোক।

১৯। আমার ঘুরতে যাওয়ার খুব ইচ্ছা।
ব্রেন বলে থাইল্যান্ড।
মন বলে মালদ্বীপ।
মানিব্যাগ বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে পাশের পাড়া থেকে ঘুরে আয়।

২০। পরীক্ষার প্রশ্ন হাতে নিয়ে সবাই আগে প্রশ্ন দেখে। কিন্তু আমি আগে পাশের জনের রিয়্যাকশন দেখি। ও খুশি হলে আমি প্রশ্ন দেখি, আর না হলে পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত ওর খাতা দেখি।

২১। পরীক্ষার আগের রাতে ভাবলাম কী কী টপিক বাকি আছে তার একটা লিস্ট করি। রাতে লিস্টটা লেখা শেষ করে ঘুমালাম।
সকালে উঠে কোনটা লিস্ট আর কোনটা সিলেবাস বুঝতে পারতেছি না।

২২। স্ত্রী: কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ?
স্বামী: আগের বার যাকে রক্ত দিয়ে ১ লাখ টাকা পেয়েছিলাম তাকে রক্ত দিতে গেছিলাম।
স্ত্রী: তো এইবার কত টাকা দিল?
স্বামী: মাত্র ১০০ টাকা।
স্ত্রী: কি আর করবে বলে, ওনার শরীরে তো এখন কিপ্টার রক্ত ঢুকে গেছে।